রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস

পুলকেশ দে সরকার

সাহিত্য
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : এ. মিত্র
[illegible] শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৬৮
মুদ্রক : ধনঞ্জয় সামন্ত
মহেন্দ্র প্রেস, ৫৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

মূল্য : ৩'৫০

শ্রীদীনেশচন্দ্র দে সরকার

শ্রীচরণেষু

মেজদা,

(যে-কালে রবীন্দ্রনাথকে কিছুই বুঝতাম না তখন কি ক'রে নির্বিচারে তাঁর সমালোচনা করতাম আজ ভাবলে লজ্জা পাই। আজ সেকথা স্মরণ ক'রে এটুকু উপলব্ধি হয়েছে যে, অজ্ঞতাই এ জগতে সব চাইতে বেশী মুখর। পরিণত বয়সে যতই রবীন্দ্রনাথ পড়ছি ততই বুঝছি ওঁর সৃষ্টির এক একটি দিক উপলব্ধি এক একটি দীর্ঘ গবেষণা-সাপেক্ষ।) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রবেশ করছি, এ তার সূচনা। যতই এগোব ততই নিজের দৃষ্টিরও যাচাই হ'য়ে যাবে। আপনাকে সেই সূচনাটুকু উৎসর্গ করলাম। ইতি—

২০. ৪. ৬১

লেখকের অন্যান্য বই

ঝাঁসীর আশীর্বাদ। লেডী রম্। আচরণবাদ

বালির প্রাসাদ। অনিরুদ্ধ

(উপন্যাস শুধুই উপাখ্যান নয়। তাতে বক্তব্যও একটা থাকে। সেই বক্তব্য আশ্রয় ক'রে কতকগুলো চরিত্র ফুটে ওঠে এবং চরিত্রগুলোর উপলখণ্ডে গল্প প্রবাহ ব'য়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর উপন্যাসেও বক্তব্য আছে। সে বক্তব্য বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে সমগ্রতা লাভ করেছে।) সে বক্তব্য কি, সে চরিত্রগুলো কি এবং এসব আখ্যানের মূল্যই বা কি? বউঠাকুরানীর হাট, নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ—কেন এবং কিভাবে পরস্পর থেকে পৃথক এবং কোথায় এদের ঐক্য—অথবা এই সকলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস উপন্যাস-রাজ্যে কি এবং কতটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছে?

এ সব প্রশ্ন তাঁদের মনেই উঠবে যাঁরা সাহিত্যকে একটা আকস্মিক আবির্ভাব মনে করেন না এবং সাহিত্যিককেও নয়। এই গ্রন্থে তারই জবাব দেবার চেষ্টা হয়েছে, স্তুতির পথে নয়, বিশ্লেষণের পথে।

আমাদের দেশে প্রতিভা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, প্রতিভা অন্ধ। প্রতিভা একটি আবেগ। প্রতিভা একটি পাগলাঝোরা। সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা সৃজনীশক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক এবং আধ্যাত্মিক মনে করেন, তাঁদের এই ধারণাটি বদ্ধমূল। প্রতিভাবানের সচেতন বা পরিকল্পিত সৃষ্টিকে তাঁরা স্বীকার করেন না; প্রতিভাবান লেখককে তাঁরা সামাজিক পারিবেশবিমুক্ত ঊর্ধ্বাকাশে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই ক'রে তাঁরা প্রতিভাবান লেখককে যে অপমান করেন এবং প্রতিভাকে ছোট ক'রে দেখেন, এই বোধটিও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।

এ কথা তাঁরা কেন বলেন না যে, প্রতিভাবানের দৃষ্টি অসাধারণ, সাধারণের দৃষ্টিতে যা এড়ায় ওঁর দৃষ্টিতে তা এড়ায় না, সাধারণ্যে যে গ্রহণক্ষমতা আছে তার চাইতে তাঁর গ্রহণক্ষমতা বেশী এবং সাধারণের দৃষ্টি-গ্রাহ্য জিনিস তিনি দূরদর্শিতায় আত্মসাৎ করেন ও তাই সাধারণের চাইতে বেশী—অনেক বেশী ব্যক্ত করতে পারেন, উপন্যাসে বা গল্পে যখন তিনি তাঁর মানসধৃত ভাব ছক কেটে প্রকাশ করেন তখন তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, তাঁর চৈতন্যের উদয় হয়েছে ব'লেই তিনি অ-চেতন জনগণের মধ্যে প্রতিভাবান ?

একথা স্বীকার করতে আমাদের অনেকেরই বড় কুণ্ঠা। ঠিক এই বাস্তববোধের অভাবেই প্রতিভাবান মনীষীকে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী করার ব্যগ্রতা দেখা যায়। আমাদের অনেকেরই বলিষ্ঠ চরিত্রের জ্ঞান যৌনলিপ্সার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজের ক্যারেক্টার আমাদের নেই। (কামিনীকাঞ্চন সম্পূর্ণ ত্যাগ না করতে পারলে আমরা কাউকে চরিত্রবান ব'লে গ্রহণ করতে চাই না ব'লে গার্হস্থ্যাশ্রমে পরিপুষ্ট পুত্রকলত্রপরিবৃত মনীষীকেও যতক্ষণ না আমরা কল্পনায় স্ত্রীসঙ্গবর্জিত করতে পারছি ততক্ষণ যেন স্বস্তি পাই না। সুতরাং, প্রতিভাবান ব্যক্তি যেখানে ঋষিকল্প, সেখানে তাঁকে মাটিতে নামাই কেন বা তাঁর প্রতিভাকে পার্থিব চেতনার ধূলায় মাখি কেন ? সাহিত্যক্ষেত্রেও যদি এই প্রতিভা প্রবাহ ব'য়ে যায়, তবে তা ভগবানের আকস্মিক আশীর্বাদ ব'লেই মেনে নিতে হবে—জাগতিক বর্ণমালার সাহায্যে তার বিশ্লেষণ চলবে না। দূর থেকে হীনচিত্তে শুধু এই কথা উচ্চারিত করতে হবে ঃ হে বঙ্কিমচন্দ্র তোমায় প্রণাম, হে রবীন্দ্রনাথ তোমায় প্রণাম, হে শরৎচন্দ্র তোমায় প্রণাম !

অথবা তোমরা রক্তমাংসের নও, তোমরা পৃথিবীর নও, তোমরা অকস্মাৎ স্বর্গচ্যুত দেবতা, মৃত্তিকায় তোমরা অমলিন।

এ স্তুতিবাদ সাহিত্যবিচারের রীতি হ'তে পারে না। কেননা, তাতে আর যাই হোক সাহিত্যসৃষ্টিকে আদৌ উপলব্ধি করা যায় না।)

অথচ যে-ঐতিহ্য বা পৌরাণিক কাহিনীর মর্মধারা অনুসরণ ক'রে কোন ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে দেবত্বের আরোপ করা হয় সেখানে কিন্তু স্খলিত দেবতার মর্ত্যবেদনাবোধের স্বীকৃতি আছে, জন্ম আছে, জাগতিক দুর্ভোগ আছে, মৃত্যু বা অপমৃত্যুও আছে। প্রতিভাবান অসাধারণ সাহিত্যিকের ক্রমবিকাশে তবে জন্মমৃত্যুর বেদনার মধ্যে জাগতিক অভিজ্ঞতার সত্যটুকু থাকবে না কেন ?

আর সত্যি ক'রে তাঁর সাহিত্যসৃজনীশক্তিকে তার ঐ জাগতিক অভিজ্ঞতার সত্যটুকু দিয়েই কেবল সঠিক বোঝা যায়, নান্য পন্থাঃ। যিনি যত বড় প্রতিভাবান ব্যক্তিই হোন, তাঁকে বুঝতে হ'লে তাঁর গায়ের প্রত্যেকটি ধূলিকণা দিয়েই তাঁকে বুঝতে হবে।

সরাসরি উপন্যাস বা গল্পে লেখককে বোঝাব, লেখকের আঙ্গিক-উপজীব্য বিচার করা সহজ,—অথচ ঐ যে নির্বিচারের দৃষ্টি তা ঐ অসৎ জিনিষকেই সৎ ক'রে তোলে। এর উদাহরণ হ'চ্ছে এই যে, (শরৎচন্দ্রকে একদল সাধু ব্যক্তি বললেন অশ্লীল, আর একদল বললেন বাস্তববাদী, যেহেতু বাস্তব জীবনে ঐরকম ঘটনা বা চরিত্রের দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল, আর একদল অনেক পরে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, শরৎচন্দ্রের হয়তো-বা কোন আদর্শ আছে।) আজ মনে না থাকতে পারে কারও, কিন্তু স্বর্গত রাজনৈতিক ও পরে সমাজনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের পরিচালনায় সুনীতি-গোষ্ঠীর প্রতাপ কাটিয়ে উঠতে শরৎসাহিত্যকে কঠিন বেগ পেতে হয়েছে। ঠিক একই রকম বেগ পেতে হ'য়েছে এই সংশয়টুকুমাত্র প্রকাশ করায়ও যে, তিনি বাস্তববাদী বা বাস্তবধর্মী (বা দক্ষ রিপোর্টার) নন, তিনি আদর্শবাদী। (আমাদের মনে আদর্শ বলতেই বিবেকানন্দকে মনে আসে, আদর্শ বলতে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা মনে আসে না। যেন আমাদের কাছে আদর্শের বাহ্যিক আচরণটি বড়, আদর্শ বা লক্ষ্য নয়। সুতরাং আদর্শবাদী বলতে শরৎচন্দ্র নিজে কামিনীকাঞ্চন ও আনুষঙ্গিক অসঙ্গত আচরণবর্জিত সন্ন্যাসীর আদর্শজীবন পালন করছেন কিনা এবং তাই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, এই অভ্যস্ত

ভাবনাটিই মনে আসে। এই কারণেই, বহুদিন শরৎচন্দ্রকে আদর্শবাদী ব'লে গ্রহণ করতে মাত্রাহীন কুণ্ঠা দেখা গেছে।)

বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সব উপন্যাস নিঃসংশয়ে মৌলিক, তার মধ্যে অকাতরে নাম করা যায় চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠের।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস কয়টির নাম করি: গোরা, চোখের বালি, নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নামগুলিও করি: দত্তা, পল্লীসমাজ, গৃহদাহ, দেনাপাওনা চরিত্রহীন, শেষ প্রশ্ন, বিপ্রদাস, পথের দাবী।

আরও নাম করি: তারাশঙ্করের কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম। বিভূতি বন্দ্যোর পথের পাঁচালী, অপরাজিত। মাণিক বন্দ্যোর পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, সহরতলী ১ম, ২য়। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের নীলাঙ্গুরীয়, কাঞ্চনমূল্য। বিমল মিত্রের সাহেব-বিবি-গোলাম। সতীনাথের জাগরী।

এই অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তালিকার মধ্যে কি একটি সচেতন ধারা আবিষ্কার করা যায় না? লেখকের সামাজিক-চেতনার স্তরও কি বোঝা অসম্ভব?

না। চন্দ্রশেখর থেকে ঘরে বাইরে, ঘরে বাইরে থেকে গৃহদাহ পর্যন্ত সুর ও সুরকারের মধ্যে একটি সহজগ্রাহ্য সংযোগ থেকে গেছে—যাকে বিভূতি মুখোর নীলাঙ্গুরীয় পর্যন্ত টেনে আনা চলে। আনন্দমঠ থেকে পথের দাবী, পথের দাবী থেকে চার অধ্যায়ে পাওয়া যায় আর একটি সুস্পষ্ট সুর যার জের টানা চলে তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা ও সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী পর্যন্ত। কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে চোখের বালিতে, চোখের বালি থেকে বিপ্রদাসে আসা যায়। পল্লীসমাজ থেকে পঞ্চগ্রামে যাতায়াত করা যায়। কালিন্দী থেকে সহরতলী, সহরতলী থেকে সাহেব-বিবি-গোলামের কাছে আসা যায়—আর এদের মধ্যে যে আনাগোনার রাজপথ রয়েছে সেখানে পাওয়া যায় পথের পাঁচালী আর চলমান জীবনে বলিষ্ঠ আশাবাদ অপরাজিত।

লেখকেরা এই সৃষ্টির কাজে সচেতন ও সতর্ক।

চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলিকে একবার আনি ঃ চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী, প্রতাপ। বিষবৃক্ষে—নগেন্দ্রনাথ, কুন্দ, সূর্যমুখী। কৃষ্ণকান্তের উইলে গোবিন্দ, রোহিনী, ভ্রমর। কপালকুণ্ডলায় নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা। বঙ্কিমচন্দ্রকে জানতে বা বুঝতে এই যথেষ্ট।

ঘরে বাইরে আছে বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ। চোখের বালিতে আছে বিনোদিনী, মহেন্দ্র, আশালতা। গোরায় আছে গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, ললিতা, সুচরিতা। রবীন্দ্রনাথকে জানতে বা বুঝতে এই যথেষ্ট।

গৃহদাহে আছে অচলা, মহিম, সুরেশ। পল্লীসমাজে রমা ও রমেশ, বেণী ও জ্যাঠাইমা। দত্তায় আছে বিজয়া, নরেন, বিলাসবিহারী। চরিত্রহীনে আছে সাবিত্রী, সতীশ, উপেন, দিবাকর, কিরণময়ী। বিপ্রদাসে আছে বন্দনা, বিপ্রদাস, দ্বিজদাস, সতী। শরৎচন্দ্রকে জানতে বা বুঝতে এই যথেষ্ট।

নারীর অবস্থান বা মর্যাদা অথবা নারীর প্রতি পুরুষ প্রধান-সমাজের আচরণে যদি সমাজের প্রকৃতি বিচার করতে হয়, তবে শৈবলিনীর সমাজটি কি? কুন্দ-সূর্যমুখীর? রোহিণীর? কপালকুণ্ডলার? তা নিঃসন্দেহে বঙ্কিম-সমাজ। বিমলা-বিনোদিনীর সমাজ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-সমাজ। অচলা-রমা-বিজয়া-সাবিত্রী-কিরণময়ী-সতীর-সমাজ নিঃসন্দেহে শরৎ-সমাজ। সমাজ-চেতনাই যার যার সমাজ। সমাজের সীমাবদ্ধতা, সমাজের সংস্কার লেখকের চিত্তে জুড়ে থাকে। তার প্রতিক্রিয়ায় লেখক প্রচলিত সংস্কারের কাছে নতি স্বীকার করতে পারেন, নিরুপায় বোধ থেকে পরিতাপ করতে পারেন—প্রচলিত সংস্কারের সংশোধন-কামনা করতে পারেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারেন। এই প্রতিক্রিয়া-বৈচিত্র্য তাই লেখকের জীবনেতিহাসে খুঁজতে হবে। লেখক কিভাবে কি পরিবেশে বড় হয়েছেন তাই নয়, কি শিক্ষা লাভ করেছেন, কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং সর্বোপরি,

নিজের সামাজিক সংস্কারের গণ্ডির বাইরে আর কোন্ সমাজের আর কোন্ ব্যক্তির আর কোন্ সংস্কারের সংস্পর্শে এসেছেন, তার বিশদ ইতিহাস সংগ্রহ করতে হবে। সেই হ'ল লেখকের সমাজ-চেতনা।

একথা স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার মতলব বা অভিসন্ধি সমাজ-চেতনা নয়, আর ঐ দুটো অপদার্থে উপন্যাসের সৃষ্টি হয় না। সমাজ-চেতনা লেখকের সংস্কারে আবদ্ধ থাকতে পারে, সৃষ্টিকালে ওটি বারে বারে বা প্রতি মুহূর্তে উঁকি মারবে—এমন নয়। লেখকের পরিচিত সামাজিক ব্যক্তি বা পরিবেশই লেখককে তার রসদ যোগায়—সার্থক লেখকের পক্ষে তাই অসামাজিক অস্বাভাবিক অবাস্তব চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব নয়। নইলে তার সূচনায়ই ঐ অসামাজিক অস্বাভাবিক অবাস্তব পরিবেশকে মেনে নিয়ে এগোতে হবে—যেমন আমরা রাক্ষস-খোক্কসের প্রাসাদে ঘুমন্ত রাজকুমারীর দিকে এগোই।

শৈবলিনী রাক্ষস-খোক্কসের প্রাসাদে কল্পিত রাজকুমারী নয়। বাংলার অতি-পরিচিত হিন্দু সামাজিক পরিবেশে শৈবলিনী প্রতাপ বড় হয়েছে এবং তাদের প্রণয় জন্মেছে। কিন্তু তখন দেশে ইংরেজ নামে এক বিদেশী জাত এসেছে। মোগলের আধিপত্য তখন অস্তাচলগামী হ'লেও বিরাজমান। প্রণয়ীরা জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা থেকেও ফিরে এসেছে। শৈবলিনীর প্রবৃত্তির আগুন তাকে ঘরছাড়া করেছে—কিন্তু এবার? আর কি তাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়া যাবে? ফিরিয়ে নেয়া যাবে তাকে যে ধীরসংযত স্বামীর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাল্যপ্রণয়ীর অভিসারে বেরিয়েছিল? আজ হ'লে, জানি না, শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্র আজকের দুর্বল লেখকদের পথ মাড়িয়ে শৈবলিনীকে সিনেমায় নিয়ে যেতেন কিনা, কিন্তু সেদিন তিনি তা পারেন নি। মোগল-ইংরেজ আধিপত্য পরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বের হিন্দু সমাজে বাংলার অন্নজলপুষ্ট টোলবিমুক্ত আধুনিক শিক্ষার প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর সামাজিক পরিবেশকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এ তাঁর সীমাবদ্ধতা নয়, স্বাভাবিকতা। নারী চরিত্রের আবেগ সমাজের সংস্কারের প্রাচীরে

প্রাচীরে কিভাবে আঘাত করে এইটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি যদি সার্থক হ'য়ে থাকেন, তবে তিনি কেন যাবেন সমাজের দেয়াল ভাঙার মিস্ত্রীর কাজে? তাই গৃহত্যাগের অপরাধে শৈবলিনীর আর সমাজে ফেরা হ'ল না, শৈবলিনী পাগলিনী হ'ল। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না যেখানে এক নয় সেখানে কিন্তু সূর্যমুখীকে ঘরে ফেরানো গেছে। কিন্তু বাঁচেনি। সতীনের ঘরে কুন্দও বিষ খেয়েছে। বুনো পরিবেশ থেকে ঘরে এনেও অসামাজিক কপালকুণ্ডলাকে ঘরে রাখা গেল না, সমাজ-অসমাজের দ্বন্দ্বোত্থিত ঘূর্ণিপাকে নবকুমার-কপালকুণ্ডলা কোথায় তলিয়ে গেল? তুমি কি রোহিণী? ব'লে গোবিন্দলাল তাকে গুলি ক'রে মেরেছিল—ভ্রষ্টা বিধবার কাছেও সমাজের একনিষ্ঠার দাবী, কেননা ভ্রমরই একনিষ্ঠার প্রতীক—সমাজের একান্ত কামনার বস্তু। সতীনও নয়, পরকীয়া প্রেম; পরকীয়াও নয় দেহজ আকর্ষণ; এ বঙ্কিম-সমাজের কাম্য নয়।

(রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের—ব্রাহ্মণ্য সমাজের নন। ইংরেজ আধিপত্য তখন অবিসংবাদী। ইংরেজী শিক্ষার অগ্রগতি ঘটেছে অনেক। মোগলেরা সম্পূর্ণ বিলীন। বিনোদিনী বিমলাও ঐ কালের ঐ পরিবেশের। সিনেমা-যুগের নয়। সেখানে বিনোদিনীর প্রেমের পরিণতি সামাজিকতার গণ্ডিমধ্যে অসামাজিক হ'তে পারে অসামাজিক গণ্ডিমধ্যে সামাজিক হ'তে পারে না। হয়ও নি।)

শরৎবাবু কিরণময়ীকে ঘুম পাড়াতে চেয়েছেন, সে যেন-না বহুতত্ত্বের তর্কজালে নিজেকে জড়িয়ে প্রচলিত সংস্কারমুক্ত আবেগ প্রকাশ করে, সে যেন দিবাকরকে নিতান্ত বালক ব'লেই উপেক্ষা করে, সমাজনিষ্ঠ উপেনের দৃষ্টি আকর্ষণের বেশী কিছু যেন সে না করে। আর, সাবিত্রী সতীশকে যতই আকৃষ্ট করুক, ও যেন সমাজের বাইরেই থাকে—ও তো সমাজের মেয়ে নয় (নটীদের দেবী ব'লে গ্রহণ করার ঔদ্ধত্য বা সামর্থ্য এ সমাজের ছিল না)। কমলকে তাই নগরের বাইরে রাখতে হয়, নগরের নিয়মে সে যেন না শৈবাচারে ব্যতিক্রম ঘটায়—প্রশ্ন যা বা যত তোলার তুলুক। জবাব দেবে বিপ্রদাস—আশুতোষবাবুও নন।

বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা যত পরিস্ফুট অথবা শরৎচন্দ্র বিপ্রদাসের প্রত্যেকটি চরিত্র সৃষ্টিতে, এমন কি, নামকরণে যত সচেতন, এমন আর কোথাও কোন উপন্যাস বা চরিত্র সৃষ্টিতে নন। বিপ্রদাসই শরৎচন্দ্রের আদর্শ। শেষ প্রশ্ন অবধি তিনি মায়ের মমতা আর ঋষির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে সমাজকে পর্যবেক্ষণ ক'রে গেছেন—সেই মমতা ও দৃষ্টি সংহৃত বা কেন্দ্রীভূত হয়েছে 'বিপ্রদাসে'।

এর পর বুঝতে কষ্ট হয় না, লেখক যদি প্রতিভাবান হন, হ্যাঁ, লেখা হবে; কিন্তু তিনি যদি সচেতনও হন, তবে সে লেখা কেবল ধূম্রপায়ীদের সাময়িক তৃপ্তির মতো রসোত্তীর্ণ হবে না, স্থায়ী সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিতে অবিসংবাদিত স্থান অধিকার করবে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সচেতন লেখকের পরিচয় নেই ব'লে ও অনেকটা রূপক-রোমাঞ্চ সিরিজের কাছ ঘেঁষে গেছে, সহরতলীর প্রথম খণ্ডে ব্যক্তিগত অভিমানের প্রাধান্য, কিন্তু সহরতলীর দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজগত সম্বন্ধের প্রাধান্য—লেখক সহরতলীয় দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজ-সচেতন, সমাজের মধ্যে তাঁর আত্মাভিমান বিলীন, তাই দ্বিতীয় খণ্ড অধিকতর রসোত্তীর্ণ ও স্থায়িত্বে সার্থক। নয় বছরে গৌরীদান আজ নেই, কিন্তু আজও শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া পড়লে চোখে জল আসে। মনেও হয় না ও অতীত, গত দুঃস্বপ্নের রাত্রি মাত্র।

(লোকে বলে কাঁচা লেখা, পাকা লেখা। মানে কি? সোজা কথায়, অভিজ্ঞতার অভাব বা অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য। কিসের অভিজ্ঞতা? জীবনের অভিজ্ঞতা। জীবন কোথায় কাটে? সমাজে। তাহ'লে জীবনে এই সামাজিক অভিজ্ঞতার কম-বেশীর ওপর কাঁচা-পাকা লেখা নির্ভর করে। অবশ্য সকলেরই শরৎবাবুর মতো চিত্তস্পর্শী ভাষা থাকে না—যেমন মাণিকবাবু বা তারাশঙ্করবাবুর নেই। প্রবোধ সান্যাল ও অচিন্ত্য সেনের ভাষা চমৎকার, কিন্তু মাণিকবাবু তারাশঙ্করবাবুর মতো সার্থক ঔপন্যাসিক নন। ওঁরা গাল্পিক।

আসলে সংবাদপত্রের রিপোর্টার আর লেখকে যে পার্থক্য,

প্রতিভাবান আর সচেতন প্রতিভাবান লেখকের মধ্যে সেই পার্থক্য। সংবাদপত্রের রিপোর্টার কেবল সংঘটিত ঘটনার যথাযথ বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু লেখককে তার প্রত্যেক ঘটনা বা চরিত্রের একটি ন্যায়সম্মত রীতি (লজিক) অনুসরণ করতে হয়, চরিত্র "সৃষ্টি" করতে হয়। প্রতিভাবান লেখকের পক্ষে তা সম্ভব, সুতরাং তাঁর কাছে একটি নির্ভরযোগ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সচেতন প্রতিভাবান লেখক সেখানেই ক্ষান্ত হবেন না, বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের গতি পরিণতি সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টি প্রখর—তিনি বহুদূরদর্শী, তাই তাঁর চরিত্রগুলোর আচরণে ঐ ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সঙ্কেত পাওয়া যায়, অথবা বর্তমানে দুঃখে কাতর হতে দেখা যায়—এগোও, নয়তো পিছোও—এই দ্বিধা ইঙ্গিতও ব্যক্ত হয়। ঠিক এই কারণে সচেতন লেখক মতলববাজ লেখক নন, সচেতন প্রতিভাবান লেখক ঐতিহাসিক গতি-পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ,—ওয়াকিবহাল।) রূপকথার সেই নদীর জলধারায় ভাসমান দীর্ঘ কেশ দেখে রাজকন্যার সন্ধানে ছোটার মতো আধুনিক 'প্রগতি' কালের 'শাড়ী' দেখে গল্প-ফাঁদার ছেলেমানুষী তাঁর মগজে স্থান পায় না। বা গোঁড়ার মতো দাগে দাগ বুলোনোর কূপমণ্ডুকতাও তাঁর চিন্তাকে খর্ব করে না। তিনি চাকা পেছনপানে ঘুরোবার অপবাদে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা পেতে পারেন, সুমুখপানে ঘুরন্ত চাকায় নিজের হাল ছেড়ে দিয়ে সাধারণ অর্থে অদৃষ্টবাদী হ'তে পারেন, ঘুরন্ত চাকার সঠিক গতি নির্ণয় ক'রে বলিষ্ঠ হাতের নিয়ন্ত্রণ চেষ্টায় বিপ্লবী অভিধা পেতে পারেন—কিন্তু অচেতন অন্ধ লেখক তিনি কিছুতেই নন। তিনি সচেতন সার্থক লেখক, তাঁর সঠিক বিচার হবে সামাজিক পরিবেশে, তাঁর সমাজ-চেতনার পরিমাপ নির্ণয়ে।

পরিশেষে কিছু কৈফিয়ত কিছু সঙ্কল্প জানাবার আছে। মূল বইয়ের আকৃতি বা ব্যাপ্তির অনুপাতে আলোচনা সমাকৃতি বা সমব্যাপ্তি পায়নি।

এরকম কোনো প্রয়োজনবোধও আমার মনে জাগেনি। কোন একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মূল সুর ধরতে গিয়ে যা দাঁড়ালো তা প্রবন্ধের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন আবার গ্রন্থের কলেবরসদৃশও নয়। লেখার মধ্যেও স্ফীতিপ্রবণতা সংযত করার লক্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ, বহু কথা আরও স্পষ্ট ক'রে বলার এবং এদের ঐতিহাসিক পরিবেশকে স্ফুটতর করার অবকাশ আছে। এ-বিষয়ে সচেতন থেকেও এবার রবীন্দ্র শতাব্দীতে মূল সুরটিই ধ্বনিত করলাম ; অবকাশ পূর্ণ করার সময় ও সুযোগ যদি আসে তবে বক্তব্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবো এ সঙ্কল্পও জানিয়ে রাখছি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বিশেষণই প্রয়োগ করি না কেন, দেখা যাবে, বহুবার তার প্রয়োগ হয়ে গেছে। যদি বলা যেত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এক স্বতন্ত্র রাজ্য, তাহলে হয়তো কিছু নতুন বলা হ'ত; কিন্তু সে-কথা সত্যি হ'ত না। কেননা, তাঁর উপন্যাসের উপাদান ও সংগঠনে পূর্ববর্তীদের অনুস্মৃতি আছে। অথবা যদি বলা যেত, রবীন্দ্রনাথেরই সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে—তাঁর কবিতা, গান, নাটক, প্রবন্ধ, এমন কি গল্পগুচ্ছ থেকেও তাঁর উপন্যাসের জগৎ আলাদা, হয়তো তাতে একটা নতুন জিজ্ঞাসার অবলম্বন পাওয়া যেত, কিন্তু সেও সত্যি হ'ত না; কেননা, সেখানেও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সুরটি প্রতিধ্বনিত।

এই উপন্যাসের ক্রমিক ধারার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষার ক্রমবিকাশও অত্যাশ্চর্যরকমে দৃশ্যমান। শব্দ-নির্বাচন ও বিন্যাস-কৌশলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সূর্যালোকের মতো স্বীকৃত, কিন্তু এই নৈপুণ্য সূচনাকালেই অথবা একই কালে প্রস্ফুটিত হয়নি, কালক্রমে পুষ্টিলাভ করেছে। তাঁর কাব্য-কবিতায় তিনি বহু বিচিত্র সুদৃশ্য বর্ণের যে পুষ্পোদ্যান সাজিয়েছেন তা এই সুনির্বাচিত ও সুসন্নিবিষ্ট শব্দ-সম্ভারেরই বাঙ্ময় রূপ। তাঁর প্রবন্ধ রচনায়ও শব্দ-সমষ্টি সার্থক যোজনাবলে ব্রহ্মশক্তি লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কে সর্বত্র এ কথা খাটে না। মাঝে মাঝে এখানেও কাব্যরূপ আছে, কেননা, তাঁর

মন প্রধানত বিশ্লেষণধর্মী কবি-সুলভ; প্রকৃতি অথবা পরিবেশ-বর্ণনায় এই ধর্ম স্বতঃপ্রকাশ, পাছে কাহিনী কাব্যোচ্ছ্বাসে ব্যাহত হয় সেজন্য তা পরিমিতির সীমায় সুন্দরও সন্দেহ নেই; কিন্তু নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা-কে লক্ষ্য ক'রে বলতে পারি, তাঁর উপন্যাসের ভাষা, এমন কি বর্ণনারীতি, কাব্য বা প্রবন্ধের মতো বলিষ্ঠ নয়, কোথাও কোথাও দুর্বল ও ক্লান্ত। চার অধ্যায় বা শেষের কবিতার জাত আলাদা; প্রথমটিকে রাজনৈতিক, দ্বিতীয়টিকে সামাজিক শ্লেষ বলে গণ্য করলেও, এ দুটোয় ভাষার গতিতে দ্বিধা বা শব্দ-দৈন্য নেই; অবাধ প্রপাতের মতো অনর্গল নেমে গেছে। একটু আগে যে তিনখানি উপন্যাসের নাম করা গেল তাদের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি-সৌকর্যে অভ্যস্ত আমাদের মনে ঐসব বইয়ের কোন কোন জায়গা অরাবীন্দ্রিক বলে প্রত্যাখ্যান করতে ইচ্ছে জাগে। এই 'প্রত্যাখ্যান' শব্দটিই তিনি নৌকাডুবিতে যেখানে ব্যবহার করেছেন সেখানে 'প্রত্যাহার' শব্দটিই উপযুক্ত: "এই অবস্থায় যখন ক্ষেমংকরী বিবাহের প্রস্তাবটাকে কতকটা প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলেন তখন হেমনলিনীর মনে দুই বিপরীত ভাবের উদয় হইল।" আর এক জায়গায়: "এই বলিয়া রমেশ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের কার্যভার লইয়া প্রস্থান করিল।" এখানে প্রকৃত অর্থ এই যে, ইতিমধ্যে যে নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে তা প্রত্যাহার ক'রে অন্য কোন দিন স্থির করা।

ভাষার দিক থেকে নৌকাডুবি-চোখের বালি-গোরাকে এক প্রান্তে এবং চার অধ্যায়-শেষের কবিতাকে যদি আর এক প্রান্তে রাখা যায় তবে 'ঘরে-বাইরে' দিয়ে এই দুয়ের ব্যবধানের ওপর সেতু গড়া যায়। কেননা, 'ঘরে বাইরে'র রচনা স্পষ্টতই সূচনার ভাষাকে ছেড়ে আসা এবং শেষের কবিতায় পরিণত হওয়ার নির্ভুল ইঙ্গিত। শুধু তাই নয়, নৌকাডুবি-চোখের বালি-গোরার ভাষায় যে প্রাক্-রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাষার অনুস্মৃতি অনস্বীকার্য, ঘরে বাইরেতে তার অস্বীকৃতি নিঃসন্দেহ। ঘরে-বাইরের ভাষা একান্তভাবে রাবীন্দ্রিক এবং পরবর্তীকালের

দিগ্ দর্শন।*) ইচ্ছে হচ্ছে এও বলি, ভাব-রাজ্যেরও এখানে বিচ্ছেদ সুরু হয়েছে, যদিও ঘরে-বাইরে-কে আমি ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের সগোত্র মনে করি। ঘরে-বাইরে সম্পর্কে লেখকের যে-মনোভাবই থাক অথবা যে-প্রেরণা থেকেই এর জন্মলাভ হয়ে থাক না কেন, পাঠকের কাছে যেভাবে তা উৎসারিত বা প্রতিভাত হয়েছে তা যদি যুক্তিগ্রাহ্য হয় তবে তাও সমান সত্যের মর্যাদা দাবী করতে পারে, সম্ভবত বেশীই পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বাংশে পারে। এর আপেক্ষিকতা নির্ভর করে সৃষ্টিক্রিয়ায় লেখক কতখানি সচেতন এবং পাঠক কতটা গ্রাহ্যশক্তি ধরে না তার ওপর। প্রবাদ আছে, বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্মা নিজের পুত্র সৃষ্টিকালে চামচিকা নামে এক নগণ্য জীবের অতিরিক্ত সৃষ্টি করতে পারলেন না। স্বর্গকে লক্ষ্য করেও ত্রিশঙ্কু অবস্থা হ'তে পারে এবং বিশ্বামিত্রের মতো ঋষিও সৃষ্টিকার্যে ব্যর্থ হতে পারেন। পক্ষান্তরে, সৃষ্টির তাৎপর্যকে না বুঝে পাঠকও কোন নির্বোধ উপসংহারে পৌঁছোতে পারেন। সুতরাং, বিচারকালে লেখকেরই কি, পাঠকেরই কি, সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলো দ্বিতীয়বার ভেবে দেখতে হবে।

কিন্তু ভাষা বা বাহ্যিক আবরণ বিচার-বিশ্লেষণের পরই অন্তরের বস্তু উন্মোচন ও উপলব্ধির চেষ্টা সমগ্রকে পাওয়ার সহজ পথ মনে করি।†

নৌকাডুবির জন্ম বা আবির্ভাবকাল ১৯০৬। তার কাহিনীর ভাষা এই ঃ

"এ পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ আছে।"

এর সংলাপের ভাষা ঃ

* রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, এখানে তাঁর আঙ্গিক-উপজীব্যের ঋতু-পরিবর্তন ঘটেছে।

† কেননা, ভাষার মধ্যেও মানুষের ভাব প্রকৃতি প্রকাশ পায়। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির যদি পরিবর্তন ঘটে, তবে ভাষাতেও তা প্রতিবিম্বিত হয়।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "এই যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল। আজকাল চিঠি লেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি বা লেখ তবু ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায়? বিশেষ কোনো কাজ আছে?" রমেশ কহিল, "না, আদালত হইতে ফিরিতেছি।"

এর সঙ্গে আর এক প্রান্তের শেষের কবিতার ভাষা মিলিয়ে পড়লেই অসাধারণ রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হবে:

"অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের; যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন-রাখা যাদের ব্যবসা ফ্যাশান তাদেরই।"

এর সংলাপ:

লিসি—এম. এ.তে বটানিতে ফার্স্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।

অমিত—কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে-আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার।

শেষের কবিতার রচনাকাল বাংলা ১৩৩৬ (ইং ১৯৩০) ভাদ্রমাস।

যাকে আমি এই দুইয়ের ব্যবধানের ওপর সেতু বলেছি সেই 'ঘরে-বাইরের' ভাষা হচ্ছে এই:

"স্বামীকে দেখলুম তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন কি তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা ঘুচল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়ল।"

এর সংলাপ:

নিখিলেশ—আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা-পাওনা বাকী আছে।

বিমলা—কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হ'ল কোথায়?

নিখিলেশ—এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে। তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

'ঘরে বাইরে'র রচনাকাল ১৯১৬ (বাং ১৩২২)।

তাহ'লে একপ্রান্তে ১৯০৬, আর একপ্রান্তে ১৯৩০, মাঝখানে ১৯১৬।

গোরার ভাষা :

"তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক সভ্যতার লাভলোলুপ কুশ্রীতায় জলে-স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রীজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীত সন্ধ্যায় নগরের নিঃশ্বাস কালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না।

এর সংলাপের ভাষা :

পরেশবাবু—আমি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানি। ব্যক্তির সেই স্বাধীনতার দ্বারা আঘাত করেই আমরা ঠিক মতো জানতে পারি কোনটা নিত্য সত্য, আর কোনটা নশ্বর কল্পনা—

এখানে লেখকের কাহিনী বর্ণনার ভাষা "নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না," অর্থাৎ এতাবৎ অনুস্থত গ্রন্থের ভাষা, কিন্তু সংলাপের ভাষা "আঘাত করেই আমরা ঠিক মতো জানতে পারি," অর্থাৎ কথ্যভাষার অনুগত।

১৯০৮ সালে, ১৯০৬ থেকে দু'বছরের মধ্যেই এই অধাংশিক রূপান্তর ঘটেছে। চোখের বালিতে কিন্তু নৌকাডুবিরই অনুস্থতি বিরাজমান :

"বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছে।...পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না।"

সংলাপ : মহেন্দ্র কহিল, পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আসিয়াছি।

মা কহিলেন, তোর পান তো আমার ঘরে সাজা আছে।

ভাষার বিচারে নৌকাডুবি ও চোখের বালি বঙ্কিমের কালকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ভাবের বিচারেও বহুলাংশে তাই ; কিন্তু গোরায় ভাষার ক্ষেত্রেও বটে, ভাবের ক্ষেত্রেও বটে, তর্ক বেধেছে। ঘরে-বাইরেতে ভাষার তর্ক মিটেছে কিন্তু তা ভাবানুস্থতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা পূর্ববর্তী ভাষা ও ভাব থেকে মুক্ত।

নৌকাডুবি

নৌকাডুবির প্রথম প্রকাশ ১৯০৬ সালে। বাংলা ১৩৪৭ বা ইংরেজী ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ এর এক ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি মন্তব্য করেন : এর চরম সাইকলজির প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।

নৌকাডুবি রচনার ৩৫ বছর পর ঐ বইয়েরই ভূমিকার ভাষাটি লক্ষ্য করবার মতো।

এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি উক্তি করেছেন যার ওপর আমি নিঃসঙ্কোচে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। তিনি বলেছেন, নিজের রচনা উপলক্ষে আত্মবিশ্লেষণ শোভন নয়।...নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে একাজ করা অসম্ভব।

একথাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে চাই এই কারণে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বন্দ্বে লেখকের মনে একটি বিশেষ ভাব বা প্রশ্নের উদয় হতে পারে বা হয়ে থাকে। সে ভাব কাহিনীতে রূপান্তর করার একটি নক্সা বা প্যাটার্ণও তিনি স্থির করতে পারেন। মূল ভাব আর নক্সা রেখায় রেখায় যদি মিলে যায় তো সেই ভাব ও ভাবুক লেখক সার্থক হন। কিন্তু যদি নক্সাটি ভাবানুরূপ না হয়, তবে? তবে পাঠকের প্রতিক্রিয়া, সংজ্ঞা ও নামকরণই প্রবলতর ও গ্রাহ্য।

এখানেও, নৌকাডুবির ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের ভাবটি যদি প্রকাশের রেখায় রেখায় মিলে যায়, তবে বলা যাবে ভাবপ্রকাশের দিক থেকে·

এ সার্থক হয়েছে। কিন্তু সেখানেও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ভাবপ্রকাশের অবলম্বন কাহিনীটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি? প্রবন্ধ থেকে কাহিনীর পার্থক্যই এই যে, কাহিনীর বক্তব্য যাই থাক, কাহিনীর একটি নিজস্ব রস থাকা চাই। সে রসের অভাব থাকলে কাহিনীটিও সর্বাংশে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাহিনীর প্রকাশভঙ্গিকে প্রবন্ধ রচনার ভঙ্গি থেকে পৃথক ক'রে দেখা কঠিন হবে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠা পাবে না, মহৎ সৃষ্টির সাহায্যেও সে স্থায়ী হবে না।

কিন্তু নৌকাডুবিতে যে-সাইকলজির প্রশ্নই লেখকের লক্ষ্য হোক, কাহিনী হিসেবেও এর একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং সেটি সর্বতোভাবে না-হোক মোটামুটি রসোত্তীর্ণ। এই শ্রেণীর কাহিনী অনেকটা রহস্যসিরিজের মতো হয় এবং আকস্মিকতাই এদের বৈশিষ্ট্য এবং এর ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে একেবারে সমাপ্তিতে বা সমাপ্তির মুখে। এতে কিছু কিছু এমন ঘটনারও অবতারণা হয়েছে যা সহসা বাস্তবানুগ ব'লে গ্রহণ করতে বাধে। নৌকাডুবিতেও যেহেতু এই ধরণের রহস্য আছে এবং তার ক্রমোন্মোচন আছে সেজন্য এই কাহিনীও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই ঃ

ঝড়বাদলে দুইটি বরযাত্রীদল নৌকাডুবিতে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল। রমেশ বালুতটে আর একটি বধূকে আবিষ্কার করল। রমেশ বা বধূ কেউ কাউকে আগে দেখেনি। কিন্তু বধূর পরিচয় যখন ক্রমশ প্রকাশ পেল, তখন থেকে রমেশের মনে দ্বন্দ্ব জাগল। বধূও একদিন জিগ্‌গেস করল, আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন? এরপর রমেশের হ'ল বিপদ। এই পরের বৌকে কোথায় রাখা যায়? ক'লকাতা এবং লেখাপড়ার অছিলায় বোর্ডিংয়ে। কিন্তু কতকাল এরকম চলবে? বিদেশেও শান্তি নেই, সমাজ জুটে যায়। তারপর একদিন বধূও জানতে পারে রমেশ তার বর নয়। আত্মহত্যা করতে গিয়েও ফিরে আসে। এদিকে তার আসল বরও নৌকাডুবির

পর এই আশায় আছে যে, বৌ কোথাও বেঁচে আছে। তারপর এক অসম্ভব যোগাযোগের মধ্যে বধূর প্রকৃত বরের সঙ্গে মিলন হয়। কিন্তু এর মধ্যে আরও জট আছে। রমেশ এই অজ্ঞ অপরিচিত বধূর ক্ষেত্রে মহৎ সংযমের পরিচয় দিতে লাগল বটে কিন্তু হেমনলিনী নামে আর একটি অপরিণীতা শিক্ষিতা মেয়ের প্রতি তার মনপ্রাণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হ'ল। অথচ কমলার কোন একটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত এই প্রণয় পরিণয়ে চূড়ান্ত হতে পারে না। হেমনলিনীর রমেশের মতো সমস্যা ছিল না, সে যখন রমেশকে ভালবেসেছে তখন কিছু আর বাকী রাখেনি। অন্নদাবাবু-হেমনলিনীর ব্রাহ্মসমাজ ও রমেশের হিন্দুসমাজের মধ্যে সেকালের বিরোধের সম্পর্ক নৌকাডুবিতে আছে, কিন্তু গোরার মতো তা অসামান্য নয়। রমেশের সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রের রমেশ-কমলা সম্পর্ক আবিষ্কারের পর থেকে কাহিনী অনেকাংশে রহস্য-রোমাঞ্চের আকার নিয়েছে। ডিটেকটিভ হচ্ছেন অক্ষয়; এই অক্ষয় গোপনে হেমনলিনীর পাণিপ্রার্থী, অতএব রমেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। রমেশও এই ডিটেকটিভকে এড়িয়ে ষ্টীমারে অনির্দেশ যাত্রা করল। পথে জুটল উমেশ নামে এক বালক-চাকর আর চক্রবর্তী খুড়ো নামে এক সামাজিক সদালাপী মানুষ। রমেশের স্ত্রী হিসেবে কমলাকে এড়িয়ে যাওয়ার অস্বাভাবিকতা চক্রবর্তী-পরিবারের দৃষ্টি এড়ালো না। কমলা গৃহত্যাগ করল। আত্মহত্যার উপক্রমণিকায় স্বামীর বেঁচে থাকার সম্ভাব্যতা তাকে নিরস্ত করল। তারপর গঙ্গাতীরে এক আপাতঃ কোমল কঠোর গৃহিণীর আশ্রয়ে। সেই আশ্রয়ে স্বামী সন্দর্শন—ইত্যাদি।

এই যে ঘটনা-পরম্পরার জটিল গ্রন্থি এর স্বাভাবিকতা বা বাস্তব-সম্ভাবনা মন সর্বত্র সহসা গ্রহণ করতে চায় না। বাস্তবজীবনের অনেক ঘটনা উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর (স্ট্রেনজার দ্যান ফিকসান) হ'তে পারে কিন্তু গল্প বা উপন্যাসের একটা নিজস্ব লজিক, ন্যায়শাস্ত্র বা রীতি আছে। তা লঙ্ঘন করলে মন মানতে চায় না। পাঠকের

মন যেখানে সায় দেয় না বা বিদ্রোহ করে, সেখানে গল্প বা উপন্যাস ব্যর্থ হয়েছে একথা বলতে দ্বিধা নেই। নৌকাডুবি সমগ্রভাবে বহুলাংশে রসোত্তীর্ণ হলেও ওরকম এমন অনেক ব্যর্থতা আছে এবং ঐ ব্যর্থতার উপলখণ্ডে ব্যাহত গল্পপ্রবাহকে লক্ষ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

নৌকাডুবির মতো দুর্ঘটনা স্বাভাবিক এবং বালুতটে নবকুমারের মতো একা ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ রমেশের কমলাকে আবিষ্কার চমৎকার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়েছে এবং এখানে সাফল্যের সঙ্গে সমগ্র কাহিনীর কৌতূহল জাগিয়ে তোলা হয়েছে। নিরাশ্রয় বালিকাবধূর রমেশের অঙ্কাশ্রয় গ্রহণও বড় সুন্দর। রমেশ যদি নিজের বধূকেই এভাবে আবিষ্কার করত, বাকী কাহিনীর গ্রন্থিমোচন অপ্রয়োজন হ'ত। কিন্তু এ সুশীলা নয় কমলা, অপর বরযাত্রীদলের বধূ। রমেশের বুঝতে দেরি হয়নি, বুঝতে দেরি হয়েছে কমলার। সে তার কাহিনী পরিচয় বলে গেছে এবং একবার বিস্ময়ে জিগগেস করেছে : তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন ? হয়তো রমেশ আগাগোড়া চেপে যেতে পারত। রমেশের পক্ষে কমলাকেই সুশীলা বলে বা সজ্ঞানে বধূ ব'লে গ্রহণ করার পথে বাইরের কোন বাধা ছিল না। যত বাধা অন্তরের, সামাজিকবোধের—এবং সব চাইতে বড় বাধা—রবীন্দ্রনাথ মানুষকে কেবলমাত্র প্রবৃত্তিতাড়িত না ক'রে সংযমের সৌন্দর্যে মহৎ ক'রে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে কোথাও কখনও অস্বীকার করেন নি, কিন্তু প্রবৃত্তিকেই একান্ত ক'রে দেখার মতো রুচিবোধ তাঁর ছিল না। তাই রমেশ আমাদের সম্মুখে প্রথমেই পরিচিত হ'ল তার সামাজিক বিবেক নিয়ে এবং কঠিন সংযমে সুন্দরতর প্রতিভাত হ'ল। অথচ রমেশ মানুষই এবং প্রবৃত্তিকে সংযত করা অর্থ প্রবৃত্তিমুক্তি নয়। তার সেই প্রবৃত্তির প্রকাশ পেয়েছে হেমনলিনীর সান্নিধ্যে এবং সেখানেও নারীর প্রতি নরের স্বাভাবিক আকর্ষণ সাংস্কৃতিক স্নিগ্ধতার মধ্যে নম্র উচ্চারণের মতো। কমলা তার স্ত্রী

নয়, এই জ্ঞান, যে স্ত্রী নয় তার সঙ্গে স্ত্রীর মতো ব্যবহার করতে নেই,—সুযোগ পেয়েও নয়, পরস্ত্রীর অজ্ঞানতাবশত সম্মতি সত্ত্বেও নয়, রমেশের এই সামাজিকবোধ যতখানি তাকে কমলার প্রতি বিমুখ করেছে, ততখানি প্রবলবেগে সে হেমনলিনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। একদিকে পথ যখন রুদ্ধ তখন অন্যদিকে উন্মুক্ত পথের দিকে মানুষ দ্বিগুণ আগ্রহে ছুটে যায়। কিন্তু যে-কোন পথ নয়, যদি সে উন্মুক্ত গবাক্ষ রমেশকে পঙ্কিল নর্দমায় নিক্ষেপ করত, তবে রমেশের এই সামাজিকবোধ ও সংযম মহৎ হ'ত না। সুতরাং, দুর্ঘটনাজনিত বঞ্চনায় রমেশের রুচি ও শালীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। (আজ যে-কোন নবীন লেখকের হাতে পড়লে রমেশের দুর্গতির সীমা থাকত না ; নিতান্তই যদি পরস্ত্রী-সম্পর্কিত সামাজিক বোধ থাকত তো রমেশকে হতাশার অন্ধকূপে কোনো করুণাময়ী গণিকার হাত থেকে বিস্মৃতির তরলপাত্র নিতে দেখতাম।) রমেশ বলিষ্ঠ পুরুষের মতো ঐ সমস্যা কাঁধে নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে ফিরেছে যদি কোথাও এই দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। সরলা কমলার অভিমান বা ঘনিষ্ঠ-সান্নিধ্য তাকে এই উঁচু জায়গাটি থেকে টেনে নামাতে পারেনি।

সুতরাং, সাইকলজির প্রশ্ন শুধু কমলার ক্ষেত্রে নয়, রমেশের ক্ষেত্রেও বটে। রমেশ যদি সজ্ঞানে প্রতারণা করত, তবে অজ্ঞান কমলার মাঝে মাঝে সংশয়ের বাতাস ছাড়া এই অস্বাভাবিক সংসারকে কোনকিছু বিক্ষুব্ধ করতে পারত না। কিন্তু রমেশের মনে বরাবর একটা স্ট্রেইন (strain), একটা ন্যায়-অন্যায়বোধের কাঁটা বিঁধে থাকত, হয়তো তারই কোন একটা স্ফুট বা অস্ফুট বেদনার্তিতে কমলার সাইকলজি উত্তাল হয়ে উঠতে পারত, ভয়ঙ্কর একটা অসুস্থ ট্রাজিডি পাঠককে আহত করে দিত। দীর্ঘকাল সর্বতোভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহৃত হবার পর কমলা যদি জানত যে, রমেশ তার বিবাহিত স্বামী নয়, তবে কি হতে পারত সেইটে যেমন কমলার সাইকলজির প্রশ্ন, বিবাহিত স্বামী নয় বলেই রমেশ তাকে স্ত্রীর আদর দেয়নি এই আকস্মিক আবিষ্কারও কমলার সাইকলজির প্রশ্ন।

রমেশকে আমরা পেয়েছি সামাজিক জীব হিসাবে—যার মধ্যে সামাজিক সংস্কারগুলো সজীব এবং মানুষ হিসাবে মানবিক প্রবৃত্তি ও সংযমও অতন্দ্র। কমলা বিদ্যায় বা কালচারে সমোজ্জ্বল না হলেও তার সংস্কার যাবে কোথায়? তারও সামাজিক সংস্কার এবং প্রবৃত্তি ও সংযমগুণ আছে। প্রকৃত সমাজের অজ্ঞানতা সত্ত্বেও কমলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি, অসংযত হয়নি; শৈলজার স্বামীপ্রীতিতে চঞ্চল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রমেশের বিমুখতাকে সে কোন ছলাকলায় ভাঙতে চেষ্টা করেনি।

রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ প্রকৃতির পূজারী ব'লে অপমান ক'রে থাকেন। তাঁরা একথাটি আদৌ বুঝতে পারেন না, প্রকৃতির সৌন্দর্যে যে একটি সংগঠনাত্মক ধৈর্য নিষ্ঠা আছে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেখানে মহিমাময়, নিছক প্রকৃতিতে নয়। মানুষকে তিনি সেখানে র‍্যাশানাল, সেখানে সুন্দর ও মহান্ করতে চেয়েছেন যেখানে কেবলই প্রকৃতির উদ্দামতা, কালবৈশাখীর রুদ্রতাণ্ডব সক্রিয় নয়, যেখানে শস্যশ্যামলা পৃথ্বী এবং রসসিঞ্চিত বসুন্ধরায় বসন্ত জাগ্রত। এ যেন দীর্ঘ কঠোর তপস্যার ফল। রবীন্দ্রনাথ তাই বারে বারে মানুষকে একান্ত প্রকৃতি থেকে, অনিয়মিত প্রবৃত্তি থেকে ঊর্ধ্বে রাখতে চেয়েছেন; তিনি চেয়েছেন, নর-নারীর সহজ মিলন সেও যেন হয় কালচারের মধ্যে, কেবলমাত্র প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিই যেন না সেখানে আপাতঃমিলনের বন্ধন-গ্রন্থি হয়। উভয়ের সমগ্রতার মধ্যে উভয়ের সর্বাত্মক মিলন হবে, পরস্পরের সংস্কার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আদর্শ ও লক্ষ্য মিলিয়ে হবে বন্ধন—এবং যেখানে সহজ প্রবৃত্তিটুকু অনস্বীকার্য অস্তিত্বের প্রাপ্য মর্যাদার অতিরিক্ত দাবী করতে পারবে না।

নৌকাডুবি ঔপন্যাসিক সৌকর্যের হিসাবে প্রথম শ্রেণীর নয়, সর্বতোভাবে রসোত্তীর্ণও নয়, কিন্তু এমন একটি মহৎ ভাব এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, উপসংহারে তো বটেই, অন্যত্রও পাঠককে পীড়িত বোধ করতে হয় না। আজকালের কোন কোন

উপন্যাস পাঠের পর, কেবল ব্যর্থতার জন্য নয়, বিকৃত সাইকলজির অভিব্যক্তির জন্যও, কেমন অশুচি মনে হয়। কোন কোন আধুনিক লেখক এমনই স্নায়ুদৌর্বল্যের পরিচয় দেন যে, যা তাঁর মাত্র কল্পনার বা কামনার তাই ভাষায় দ্রুতগতিতে কাহিনীর আকার দিয়ে যতক্ষণ না একটা ক্লেদাক্ত অশুচিতে পৌঁছোনো যাচ্ছে ততক্ষণ যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে থাকেন। তাতে ভাব তো বটেই শিল্পকাজও ব্যর্থ হয়। নৌকাডুবি সেই দৃষ্টিতে মহৎ, বাস্তবতার নামে মানুষের সকল সদ্‌গুণ ও মহদ্ভাব দমন করার, এমন কি অস্বীকার করার, যে-ঝোঁক আধুনিক উপন্যাসগুলিতে প্রবল, নৌকাডুবি তা থেকে বহু দূরে।

শুধু তাই নয়, নিছক বিয়োগাশ্রুও রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ দৃষ্টিকে করুণ ক'রে তুলতে পারেনি। কমলা যখন নিসংশয়ে জানল—এতদিন সে যাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধবে পরিকল্পনা করছিল এবং যাঁকে সে সেভাবেই তার হৃদয়াসনে সভক্তি আহ্বান জানাচ্ছিল তিনি তার স্বামী নন, তখন দীর্ঘকালানুসৃত হিন্দুমেয়ের সংস্কার তাকে গঙ্গাতীরে তাড়িত করল, এই অবস্থায়, এই কলঙ্কময় জীবনকে নিশ্চিহ্ন করতে গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন ছাড়া তার গত্যন্তরই বা কি? নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একবার একটা ক্ষীণ আশা উঁকি মারল: যদি তিনি বেঁচে থাকেন! একদা এক বালিয়াড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমার সন্ন্যাসিনী কপালকুণ্ডলাকে আবিষ্কার করেছিল, সে "বি-বা-হ কাকে বলে" জানে না, সে ঘর বাঁধতে চায়নি, পারেনি, অরণ্য তাকে ডেকেছে এবং নবকুমার বৃথাই তাকে ঘরের দিকে টেনেছে, নদীতট ভেঙে তার অন্তিম যেখানে করুণ—সেখানে যে-জানে বিয়ে কাকে বলে এবং যে ঘর বাঁধতে চেয়েছে, অথচ রমেশের বিমুখতাই যেখানে বাধা হয়েছে সেই গৃহীকন্যা কমলার নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন করুণতর হতে পারত মাত্র, সুসঙ্গত হ'ত না। সমস্যার সহজ সমাধানে মৃত্যুর আবেদন রবীন্দ্রনাথের-সৃষ্টিকে ক্ষুণ্ন করেনি। ডাক্তারের মধ্যে একটি বৃহত্তর মহত্তর হৃদয়কে তিনি সিদ্ধিলাভে অপেক্ষমান তপস্বীর

মতো একদিন পাঠকের সামনে উপস্থিত করলেন। অত বড় হৃদয় ছাড়া কমলার এই দুর্ভাগ্যতাড়িত পরপুরুষ সান্নিধ্যের নারীজীবনকে কে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করবে? রমেশ যেখানে সামাজিকবোধে কমলার প্রতি বিরূপ (ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে) এবং হেমনলিনীর দিকে আকৃষ্ট হয়েও কমলার জীবনভার বহন-অস্বীকারে কুণ্ঠিত, সেখানে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বলিষ্ঠ প্রত্যাশায় কমলার প্রতি একনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত ডাক্তারের চরিত্র-সমন্বয় নৌকাডুবির মতো দুর্বল কাহিনীকেও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে। কমলাকে বাদ দিলেও এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও রমেশের প্রণয়ের একটি সুপাত্রী ছিল হেমনলিনী, কমলার স্বামী ডাক্তার সে বিষয়েও নিরবলম্ব ছিল। তার জীবনে কমলা সর্বগ্রাসী—এমন প্রস্তুত ক্ষেত্রেই দৈবক্রমে পরপুরুষাশ্রয়ী কমলাকে সহজে স্থাপিত করা সম্ভব।

কিন্তু কমলা? কমলার জীবনে একটা উৎকণ্ঠা ছিল। রমেশের ইচ্ছা ছিল যে, সে কমলাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার জন্যই সকল কথা কমলার স্বামীর কাছে খুলে বলে। কমলা এ পরিকল্পনায় সায় দেয় নেই। তার একান্ত কামনা, কমলার এই জীবনটুকু তাঁর স্বামীর কাছে অকথিতই থাকে। হয়তো সে নিজেই কোনকালে সুযোগমতো স্বামীর কাছে তা নিবেদন করবে এবং তার ফলাফল সহজেই গ্রহণ করবে, কিন্তু আর যেন-না কেউ এ কাহিনী তার স্বামীকে জানায়—এবং রমেশ তো নয়ই। কি জানি, আজ এতদিন দুঃখকষ্ট উত্তরণের পর যে ফলপ্রাপ্তি হ'ল তা যদি সামান্য সংশয়ের বাতাসেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়! এখানে তার নারীসুলভ সংস্কার কাজ করেছে। পুরুষ যত সহজে সকল কথা খুলে বলতে ব্যস্ত হয়, মেয়েরা তত সতর্ক, কারণ প্রচলিত সমাজে পুরুষের এই বলায় কোন দায় নেই, তাদের ছোটবড় চ্যুতি বরাবর কেবল মার্জনা নয় প্রশ্রয়ও লাভ করেছে, মেয়েদের সামান্য চ্যুতিও নৈর্ব্যক্তিক সমাজের সহস্রদৃষ্টিতে অমার্জনীয় বলে গণ্য হয়েছে, এবং এ মত সর্ববাদী সম্মত। কমলার মনে সে-ভয় থাকা স্বাভাবিক। সেই ভয়ে সে পূর্ববর্তী

রমেশ-কমলার জীবনকে আকুল হৃদয়ে অস্বীকার করতে চেয়েছে, ভুলতে চেয়েছে। তাই এই কাকুতি—রমেশ যেন-না এ কাহিনী প্রকাশ করে। সমগ্র কাহিনীতে রমেশের যে সংযম ও সামাজিক আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে একথা ধরে নেওয়া যায় যে, সে আধুনিক কোন নায়কের মতো নায়িকার বিব্রত অবস্থায় ব্লাকমেল করবে না। কমলা রমেশকে এতদিন যতটা জেনেছে তাতে সে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে—আর, সত্যি, রমেশ তো কমলার হাত থেকে নিষ্কৃতিই শুধু চায় নি, সে চেয়েছে কমলা কোন নিরাপদ স্থানে—রমেশ থেকে দূরে—থাকুক, স্বস্থানে পুনরধিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা থাকলে তো কথাই নেই।

কিন্তু এ কমলার নঙর্থক দিক। তার একটা স্বীকারার্থক দিকও আছে। সেটিই হ'ল রবীন্দ্রনাথের সাইকলজির প্রশ্ন। রমেশ-সান্নিধ্যমুক্ত কমলা স্বামী সন্দর্শন ও মিলনের সম্ভাবনাকালে বলছেঃ আমি যে স্বামীকে কখনো দেখি নাই বলিলেই হয় আমার সমস্ত মনের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে যে কেমন করিয়া গেল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশ্নঃ স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কি না যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্‌কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, এসব প্রশ্নের সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।

সত্য কথা। যে-মেয়েরা শৈশবে ও কৈশোরে শিবপূজা করে শিবের মতো বর পাবে বলে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে জন্মজন্মান্তরে অচ্ছেদ্য ব'লে জানে, জানে তাদের বিয়েটা প্রজাপতির নির্বন্ধ ছাড়া কিছু নয়, জানে পতি পরম দেবতা এবং এই দেবতাকে তপস্যা ক'রে পেতে হয়, পাপপুণ্য সুকৃতি দুষ্কৃতি যারা কর্মফল বলে জানে—তারা যেভাবে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, অন্য পরিবেশে লালিত

পরিবর্ধিত মেয়েরাও সেভাবে একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে এমন না হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু কমলার মতো মেয়েদের পক্ষে, ঘটনাচক্রে যাকে স্বামী বলে জানতে হয়েছিল সে স্বামী নয় একথা জানতে পারলে, 'অজ্ঞানজনিত ভালোবাসার জালকে' ধিক্কারে ছিন্ন করা সম্ভব। কেননা, প্রকৃত সত্য না জেনে সে যে-কল্পিত সত্যের পেছনে ছুটেছিল তা মিথ্যা হ'ল সত্যের আবিষ্কারে। এ অনেকটা বিদ্যার্জনে জ্ঞানলাভের মতো। অজ্ঞান অবস্থা ও জ্ঞান অবস্থার মধ্যে এই পার্থক্য যে, অজ্ঞান অন্ধকারের মতো, জ্ঞান আলোকের মতো, অন্ধকারে যে মোহ বা যে কল্পিত অবস্থা থাকে, তা আলো জ্বললে দূর হয়, সত্য আপনিই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এখানেও সেই সংস্কারের কথা—সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়।

তথাপি এর মধ্যে একটি সর্বজনীন সত্য আছে। সেটি এই যে, যদি কখনও কোন মেয়ে বা ছেলে, তা সে যে দেশের যে কালের বা যে সমাজেরই হোক, কখনও হঠাৎ আবিষ্কার করে যে, সে দৈব-বশত বা ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এই মুহূর্তে যাকে সে স্বামী বা স্ত্রী বলে কল্পনা করছিল সে স্বামী নয় বা স্ত্রী নয়, তার স্বামী বা স্ত্রী আর কোথাও আছে, তবে সে নিঃসন্দেহে সেই অদৃশ্য স্বামী বা স্ত্রীর দিকেও আকৃষ্ট হবে এবং একটি কল্পিত মূর্তি ও কিছু কল্পিত আচরণ সাগ্রহে, সস্নেহে ও সগৌরবে লালন করবে। যদি কখনও অ-দৃষ্টকে দেখার এতটুকু সম্ভাবনাও উঁকি মারে, তবে সেই আগ্রহ প্রবলতর হয়ে থাকে, সন্ধান পাওয়া গেলে আরও প্রবল হয় এবং যেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে দেখা দেয়, সেখানে মিলনের আকাঙ্ক্ষাও প্রবলতম হয়। যারা শিক্ষিত, মার্জিত, সংযত তাদের কিছু-না-কিছু অবলম্বন থাকে, তাদের কেউ কেউ হয়তো সব পরিস্থিতিই নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করতে পারে, অবস্থা অনুসারে মানিয়েও নিতে পারে। কিন্তু কমলার যেখানে দৃশ্যমান কল্পিত স্বামীর অনাদরে সংসার সূচনা সেখানে মোহমুক্তির পর অদৃশ্য কল্পিত স্বামীই তার প্রবলতর

আকর্ষণ হবে দুটি কারণে—জন্মান্তর-বিশ্বাসী সেই শিবপূজার সংস্কার ও অদৃশ্য স্বামীর অস্তিত্ব তারই কল্পনার রঙে সুন্দরতর। কমলা তাই অনায়াসে অজ্ঞানজনিত ভালোবাসার জালকে ধিক্কারে ছিন্ন করতে পেরেছে এবং বিবাহিত স্বামীর খড়ম জোড়ায় তার ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছে। এই পরম প্রাপ্তি হারাবার ভয়ে পরপুরুষ রমেশের সান্নিধ্যের ইতিহাস বিস্মৃত হওয়ার আকুলতা যতখানি সত্য, নিজের সুকৃতিবলে হারানো স্বামীকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি সত্য। কমলার ভাগ্য ভাল যে, তার অদৃশ্য কল্পনার স্বামী বাস্তব স্বামীর রেখার রেখায় মিলে গেছে—সম্ভবত কিছু বেশী। কমলার জীবনে ঐ সাইকলজির প্রশ্নের উত্তরটি স্পষ্ট। সে অজ্ঞানজনিত ভালবাসাব জালকে কৃতজ্ঞতার ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছে এবং হৃদয়ের সকল অর্ঘ্য কোন অধিকার নয়, কোন দাবী নয়, প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির তাড়না নয়, ভক্তির পাত্রে উৎসর্গ করেছে।

চোখের বালি

কাহিনীপ্রধান নৌকাডুবিতে যে কথাগুলো স্বল্পোচ্চারিত, চোখেব বালি ও গোরা'য় তাই হয়েছে বিশেষ। চোখের বালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন: যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হ'ল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। গোরার কথাগুলোর মধ্যে আছে ব্রাহ্মসমাজ বনাম হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্ব এবং তার মধ্যে ব্যষ্টি মানুষের স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা বনাম দেশীয় আচার সংস্কার ইত্যাদি এবং সর্বোপরি গোরার নিজের কথা, তার জন্মবৃত্তান্ত ও লালনাগার।

ওপরেরগুলো বিতর্ক, শেষেরটুকুই কাহিনী এবং এই কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সও উপসংহারে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, তাঁর নায়ক-নায়িকা, এমনকি পার্শ্বচরিত্রগুলোও, আর্থিক সঙ্কটের দিক থেকে নিরুদ্বিগ্ন।

নায়ক-নায়িকারা অসাধারণ শিক্ষিতও বটে। রমেশের প্রথম পরিচয়েই জানা যায়ঃ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের-পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন—স্কলারশিপ ফাঁক যায় নাই।' এই রমেশ ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করেছে, বাড়ীভাড়া করেছে, ষ্টীমারে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে, বোর্ডিংয়ে কমলাকে রেখেছে, বিদেশে নতুন বাড়ী করেছে—কোত্থেকে টাকা এসেছে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। ওটি যেন কোন প্রশ্নই নয়। চোখের বালিতে মহেন্দ্র বিহারী ওরা বা গোরায় গোরা বিনয় ওরা—সবাই অতি সচ্ছল। গাড়ী-ঘোড়া, চাকর-দাসী ইত্যাদির তো কথাই নেই। শেষের কবিতায়ও তাঁর নায়ক অমিতর বাবা যে পরিমাণ টাকা জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

চোখের বালির মহেন্দ্রর পরিবেশ হচ্ছে এইঃ 'মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। এম-এ পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে' ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংসারে টিকে থাকতে গেলে যে, অর্থের প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন মেটাতে উপার্জনের সংগ্রাম করতে হয়, চোখের বালিতে এ প্রশ্ন ওঠেনি। গোরাতেও গোরা ও বিনয়ের আর্থিক অবস্থা যেমন সচ্ছল, বিদ্যার্জনেও তেমনি তারা শেষ ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছে; এখন কিছু না করলেও চলে। সুতরাং, তাঁর উপন্যাসের গতিতে আর্থিক চিন্তা কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি। তাঁর উপন্যাসের সমস্যা অন্যত্র।

রবীন্দ্রনাথ চোখের বালির ভূমিকায় লিখেছেনঃ 'আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করলে ধরা পড়বে যে চোখের বালি

আকর্ষণ হবে ছুটি কারণে—জন্মান্তর-বিশ্বাসী সেই শিবপূজার সংস্কার ও অদৃশ্য স্বামীর অস্তিত্ব তারই কল্পনার রঙে সুন্দরতর। কমলা তাই অনায়াসে অজ্ঞানজনিত ভালোবাসার জালকে ধিক্কারে ছিন্ন করতে পেরেছে এবং বিবাহিত স্বামীর খড়ম জোড়ায় তার ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছে। এই পরম প্রাপ্তি হারাবার ভয়ে পরপুরুষ রমেশের সান্নিধ্যের ইতিহাস বিস্মৃত হওয়ার আকুলতা যতখানি সত্য, নিজের সুকৃতিবলে হারানো স্বামীকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি সত্য। কমলার ভাগ্য ভাল যে, তার অদৃশ্য কল্পনার স্বামী বাস্তব স্বামীর রেখার রেখায় মিলে গেছে—সম্ভবত কিছু বেশী। কমলার জীবনে ঐ সাইকলজির প্রশ্নের উত্তরটি স্পষ্ট। সে অজ্ঞানজনিত ভালবাসার জালকে কৃতজ্ঞতার ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করেছে এবং হৃদয়ের সকল অর্ঘ্য কোন অধিকার নয়, কোন দাবী নয়, প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির তাড়না নয়, ভক্তির পাত্রে উৎসর্গ করেছে।

চোখের বালি

কাহিনীপ্রধান নৌকাডুবিতে যে কথাগুলো স্বল্পোচ্চারিত, চোখের বালি ও গোরায় তাই হয়েছে বিশেষ। চোখের বালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন ঃ যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হ'ল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। গোরার কথাগুলোর মধ্যে আছে ব্রাহ্মসমাজ বনাম হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্ব এবং তার মধ্যে ব্যষ্টি মানুষের স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা বনাম দেশীয় আচার সংস্কার ইত্যাদি এবং সর্বোপরি গোরার নিজের কথা, তার জন্মবৃত্তান্ত ও লালনাগার।

ওপরেরগুলো বিতর্ক, শেষেরটুকুই কাহিনী এবং এই কাহিনীর ক্লাইম্যাক্সও উপসংহারে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্পর্কে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর নায়ক-নায়িকা, এমনকি পার্শ্বচরিত্রগুলোও, আর্থিক সঙ্কটের দিক থেকে নিরুদ্বিগ্ন।

নায়ক-নায়িকারা অসাধারণ শিক্ষিতও বটে। রমেশের প্রথম পরিচয়েই জানা যায়ঃ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের-পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন—স্কলারশিপ ফাঁক যায় নাই।' এই রমেশ ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করেছে, বাড়ীভাড়া করেছে, ষ্টীমারে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে, বোর্ডিংয়ে কমলাকে রেখেছে, বিদেশে নতুন বাড়ী করেছে—কোত্থেকে টাকা এসেছে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। এটি যেন কোন প্রশ্নই নয়। চোখের বালিতে মহেন্দ্র বিহারী ওরা বা গোরায় গোরা বিনয় ওরা—সবাই অতি সচ্ছল। গাড়ী-ঘোড়া, চাকর-দাসী ইত্যাদির তো কথাই নেই। শেষের কবিতায়ও তাঁর নায়ক অমিতর বাবা যে পরিমাণ টাকা জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

চোখের বালির মহেন্দ্রর পরিবেশ হচ্ছে এইঃ 'মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। এম-এ পাশ করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে' ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংসারে টিকে থাকতে গেলে যে, অর্থের প্রয়োজন এবং সে প্রয়োজন মেটাতে উপার্জনের সংগ্রাম করতে হয়, চোখের বালিতে এ প্রশ্ন ওঠেনি। গোরাতেও গোরা ও বিনয়ের আর্থিক অবস্থা যেমন সচ্ছল, বিদ্যার্জনেও তেমনি তারা শেষ ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছে; এখন কিছু না করলেও চলে। সুতরাং, তাঁর উপন্যাসের গতিতে আর্থিক চিন্তা কখনও বাধা সৃষ্টি করেনি। তাঁর উপন্যাসের সমস্যা অন্যত্র।

রবীন্দ্রনাথ চোখের বালির ভূমিকায় লিখেছেনঃ 'আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করলে ধরা পড়বে যে চোখের বালি

উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইসারা এসেছিল আমার মনে সে প্রশ্নটা দুরূহ।'

কিন্তু একেবারে দুরূহও নয়। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মনে ইসারা অনেকখানি অনুমান করা যায় তারই এই কথাটিতে, 'আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন।' তাঁর জীবন-স্মৃতিতে আছে ঃ

"অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। তাহার পরে বড়দলে পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখর এখন যে খুসি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি। তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আব কেহ পাইবে না।"

মহেন্দ্র বিহারীর সংলাপেও এক জায়গায় আছে ঃ

মহেন্দ্র—কী জানি, কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।

বিহারী কহিল, বল কী ? দ্বিতীয় বিষবৃক্ষ।

আরও এক জায়গায় আছে ঃ বারাশতে বিহারীর 'গদির একধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে।···মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।'

বিনোদিনীর পাঠ্যবস্তুও যে ছিল 'বিষবৃক্ষ' এ কথাও এক জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে।

আঙ্গিকের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় উপন্যাসে বঙ্কিমী আমলের প্রভাব সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনীকার বহুবার

কাহিনীর অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পাঠকের মুখোমুখি হয়েছেন এবং পাঠককে সম্বোধন করেছেন। চোখের বালিতেও মহেন্দ্র আশাকে শিক্ষাদানের যে প্রচেষ্টা করেছিল সে দিকে কাহিনীকার (রবীন্দ্রনাথ) পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : এমন গম্ভীর-প্রকৃতি শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন, যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে ; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, মহেন্দ্রর তত্ত্বাবধানে অধ্যাপন কার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইনস্পেক্টর তাহার অনুমোদন করিবেন না।

পরিষ্কার বোঝা যায় সেকালে রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ পাঠকেরা বিষবৃক্ষের নতুন রস সম্ভোগে মাতাল এবং এ রস তাঁদের চিন্তাধারায় মিশ্রিত হয়েছে, এই জাতীয় প্রশ্নের দোলায় তাঁরা দুলছেন। বিষবৃক্ষের আমলে বহুনিষ্ঠ পুরুষ-সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহকে সমাজ অকল্যাণকর বলেই দূরে ঠেলে রেখেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ লেখনীমুখে তা বারে বারে নিন্দিত হয়েছে। জমিদার নগেন্দ্র সাধ্বী স্ত্রী সূর্যমুখী ঘরে থাকতে সুন্দর কুন্দকে নিয়ে এলেন, সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করল, কুন্দ বিষ পান করল। সেকালের সমাজনেতারা দুই হাত তুলে বললেন, বিধবা বিবাহের এই তো অকল্যাণ।

চোখের বালি আসলে বিধবা বিনোদিনী।* বিনোদিনী যখন বিধবা হয়নি তখন তার সঙ্গে মহেন্দ্রর বিয়ের প্রস্তাব স্বয়ং মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মীই করেছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্রর অসম্মতিতে তা হয়নি। হয়েছিল আশার সঙ্গে। আশা মহেন্দ্রর কাকীমা অন্নপূর্ণার বোন-ঝি এবং মহেন্দ্রর বন্ধু বিহারীর সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব ছিল—মহেন্দ্র নিজে যেচে আশাকে বিয়ে করে। ঘটনাচক্রে বিনোদিনী বিধবা হবার পর

---

* চোখে বালি পড়লে তা চোখের অস্বস্তির কারণ হয়, না পাওয়া যায় অব্যাহতি, না যায় সহ্য করা। সাধারণ লোকে এ কথাই বোঝে। সম্বন্ধ পাতালে তার কিছু অর্থগত পার্থক্য ঘটে, কিন্তু অস্বস্তিটুকু থেকেই যায়। সেদিক থেকে এর মধ্যেও কাহিনীর একটি ইঙ্গিত রয়েছে এবং বইটির নামও সেই ইঙ্গিতের বাহক।

মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মী তাকে এ-বাড়ী নিয়ে আসেন, বিনোদিনী আশার সঙ্গে চোখের বালি পাতায় এবং বিনোদিনী মহেন্দ্রের হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু দেখা যাবে, বিনোদিনীর লক্ষ্য ছিল অপেক্ষাকৃত ধীরবুদ্ধি বিহারী। এ নিয়ে বন্ধু-বিচ্ছেদও হয়। বিনোদিনী যেখানে কুন্দ বা রোহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, আশা সেখানে ভ্রমরের-ভূমিকা গ্রহণ করে, অপেক্ষা করে সতীর প্রতিষ্ঠা একদিন হবেই—হয়েওছিল। বিনোদিনী বিহারীর ভালোবাসা পেয়েছিল, কিন্তু বিয়েতে রাজী হয়নি। কেননা, সেকালে কুন্দ-রোহিণীর প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব সমাজে প্রশমিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে লালসা বলে ধিক্কার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাকে সহজ প্রবৃত্তি বলে অগ্রাহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সহানুভূতির সঙ্গে মানুষকে এই সহজ প্রবৃত্তির উর্ধ্বে তুলতে চেয়েছেন—মানুষ যেন-না কেবলমাত্র প্রবৃত্তিবশে মিলিত হয়। এই কারণেই মহেন্দ্রর প্রবৃত্তিকে তিনি লাঞ্ছিত করেছেন, বিনোদিনীর প্রবৃত্তিকে সংযত বিহারীর দিকে প্রধাবিত করেছেন এবং বিনোদিনীর প্রবৃত্তি যখন পরিশুদ্ধ নিবৃত্তির পর্যায়ে এসেছে কেবল তখনই বিহারী বিনোদিনীর পাণিপ্রার্থী হয়েছে কিন্তু। বিনোদিনী তখন নিছক দেহের উর্ধ্বে নিজেকে প্রশান্ত করে এনেছে, বাহ্যিক মিলন সেখানে অবান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বিষ-পাত্র অথবা আগ্নেয়াস্ত্র তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে দিয়েছেন স্নিগ্ধ সহানুভূতি। বঙ্কিমী আমলের বিধবার প্রেম লালসায় পঙ্কিল ও পর্যুদস্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের আমলে সে প্রেম পরিশুদ্ধির পথে সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছে।

বিনোদ। যে কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। একি ঠাট্টা।

(উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের এই সব কাহিনী-রচনায় জিজ্ঞাসার স্থানেও জিজ্ঞাসা চিহ্নের ব্যবহার অত্যন্ত বিরল।)

বিহারী। না, আমি সত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।

বিনোদ। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য।

বিহারী। না, আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া।

বিনোদ। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আমি আর কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবে না।

অনেক কষ্টে বার বার বিহারীকে নিরস্ত করতে হয়েছে।

—ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে।···আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।

সামাজিক প্রশ্নটি এখানেই এবং এইভাবেই উপন্যাস-গল্পে সামাজিক প্রশ্ন কাল-বিধৃত। নতুবা সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। ব্যক্তি উদ্দামতা সমাজের নিয়মে সংযত এবং তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা। কিন্তু যেখানে সমাজের নিয়ম ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে যায়, বিষ বা আগ্নেয়াস্ত্রে তাকে বিনাশ করতে চায়, সেখানে ব্যক্তিচেতনায় সংঘাত জাগে, প্রশ্ন ওঠে। মহৎ প্রাণ ঔপন্যাসিক এই প্রশ্নটিই সেই হৃদয়হীন সমাজের সামনে রাখেন, দণ্ড দেন না। মহেন্দ্রর অনুশোচনার মধ্যেই তার অসংযত প্রবৃত্তির দণ্ড, তাকে প্রশান্ত সংযমের কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়। বিহারী সমাজের মানবাত্মারূপে বিনোদিনীর প্রেমকে সমাদর জানিয়েছে, স্বীকার করেছে। নিছক একটা আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক মিলনে তা লাঞ্ছিত হয়নি। সেইখানেই তার দণ্ড বা পুরস্কার। সমাজও এখানে অস্বীকৃত নয়।

// মহেন্দ্রর প্রকৃতি উদ্দাম। "বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রয় পাইয়াছে। তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল।" বিহারীর জন্য আশাকে দেখতে গিয়ে সে বিমুগ্ধ হয়ে গেল। "আশা! মহেন্দ্রর মনে হইল নামটি বড় করুণ। কণ্ঠটি বড় কোমল। অনাথা আশা!" তারপর পরোক্ষে বিহারীকে নিবৃত্ত করে নিজেই এগিয়ে গেল: "কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা

না হয় আমিই স্কন্ধে তুলিয়া লই। কী বল ?...রাত্রে মহেন্দ্রর ভাল নিদ্রা হইল না।" তারপর "যেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মন লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।" মহেন্দ্র আশাকে এমন উদ্দামতার সঙ্গে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখল যে একদিকে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মীর আর একদিকে বিনোদিনীর ঈর্ষা অপরিমেয় হয়ে উঠল।

কিন্তু যেই মাত্র "সর্বগুণশালিনী বিনোদিনীর জোড়া ভুরু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নিখুঁত মুখ, নিটোল যৌবনের" ওপর মহেন্দ্রর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল অমনি আশার চারদিকে মহেন্দ্রর "বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি ক্লান্ত" হ'ল। শুধু তাই নয়, আশার সাংসারিক অপটুতা ক্ষণে ক্ষণে বিরক্তির সৃষ্টি করতে লাগল। মহেন্দ্র তখন বিনোদিনীর রূপের মদিরাপাত্র সবে তুলতে সুরু করেছে।

মহেন্দ্র। তোমার সখীর যেরকম রূপেব বর্ণনা কর, সে তো বড় নিরাপদ জায়গা নয়।

তারপর একদিন "ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ পরিচয় বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল।" "বিনোদিনী রচিত পশমের জুতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবন্ধ তাহার কণ্ঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল।"

এই বর্ণনায় লক্ষণীয় যে, এখানকার প্রকৃত সংস্পর্শ দৈহিক, অন্তরের কিছু নয়, বাহ্যিক বস্তুর দৈহিক সংস্পর্শ মনে বিনোদিনীর শারীরিক সংস্পর্শেরই কামনা জাগ্রত করে তুলছে। মহেন্দ্রর এই বল্গাহীন প্রবৃত্তির প্রকাশ সংযত প্রকৃতি বিহারীর দৃষ্টি এড়ায় নি; সে মহেন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, "বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।"

কিন্তু মহেন্দ্রর তখন ধর্মকথা শোনবার মতো অবস্থা নয়। আশার বকলমে পর পর কয়েকখানি চিঠি পাবার পর মহেন্দ্র গৃহ প্রত্যাবর্তনের

পর বিনোদিনীর ঘর ফেরার প্রস্তাবে "মুহূর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজল স্বরে কহিল, যদি তাহাতে আমার আসে যায়, তবে তুমি থাকিবে ?"

মহেন্দ্র মাকে ভুলেছে, আশাকে ভুলেছে, সমাজ ভুলেছে, প্রবৃত্তির এমনই অন্ধ আবেগ। বিনোদিনীও তাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রকৃতিকে ও প্রবৃত্তিকে অবাধ স্ফূর্তি দিয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই চরম মুহূর্তে বলেছেন, ও মহেন্দ্র ও বিনোদিনী, তুমি তো সবটাই প্রকৃতি সবটাই প্রবৃত্তি নও, তুমি এরও অতিরিক্ত। তাই, আশা, মা, সমাজ সকল কিছু বিস্মৃত হয়ে মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর গ্রামে পাগলের মতো ছুটে গেছে, কিংবা পৃথক গৃহ করেছে, অথবা সঙ্গোপনে মিলনের সকল সুযোগ ও আয়োজনই যখন উপস্থিত ঠিক তখনই ওদের অন্তর সদ্ভাবে জেগে উঠেছে, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে নিরস্ত করেছে, নতুবা নিজে নিরস্ত হয়েছে। মহেন্দ্রও অনেকবার জবরদস্তির সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেন এই কথাটাই বার'বার দেগে দিতে চাইছেন যে, না, তোমরা বাহ্যিক প্রকাশটাকে, এই ক্ষণিক উন্মাদনায় এর পরিচয় নিও না, এর অন্তঃ-প্রবাহটাকেও দেখ—সেই চাপা-পড়া আসল মানুষটাকে। রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই স্বীকার করতে চান না যে, মানুষ একান্তভাবে প্রবৃত্তির দাস। সে শুধুই তা নয়—এই কথার ওপরই তাঁর জোর বেশী।

মহেন্দ্র তার চরম অবস্থায় বিনোদিনীর মৃত্যু কামনা করল।

বিনোদিনী। তাহা জানি, যতদিন বিহারীর আশা আছে ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না—আমিও নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়োনা, তুমি বিহারীরও হইয়োনা। তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে—তাহাদের অশ্রু আমাকে দূর

হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এ যে গোবিন্দলাল।

বিহারী অন্তরের মধ্যে আছে বিনোদিনী এমন কথা বলায় মহেন্দ্র বলেছিল, "ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।"

এ যে গোবিন্দলালের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন।

কিন্তু এখানে কেউ-ই নিহত হয়নি ; সকলেই ক্ষণিক ক্ষুদ্রকে ডিঙিয়ে গেছে, সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও পূর্ণ মানবিক সত্তাকে ফিরে পেয়ে পুনরধিষ্ঠিত হয়েছে।

বিনোদিনীর তুলনায় মহেন্দ্রর অনেক সবল অবলম্বন ছিল। স্নেহময়ী মা ছিলেন, পতিব্রতা স্ত্রী আশা ছিল, কাকীমা ছিলেন। বিনোদিনীর কিছুই ছিল না, সে নিঃস্ব।

মহেন্দ্র আর একদিন হাত চেপে ধরে বলেছিল, "বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ, তখন যাইবে কোথায়।"

"বিনোদিনী কহিল, ছি ছি ছাড়ো। যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাঁধিবার চেষ্টা কেন?"

মহেন্দ্রব মা রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রর সঙ্গে বিনোদিনীর বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিলেন। "বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে।" বিনোদিনী ধনীপুত্রী ছিল না ; কিন্তু তাহার পিতা "একমাত্র কন্যাকে মিশনরি মেম রাখিয়া বহু যত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল তবু তাহার হুঁশ ছিল না।" মহেন্দ্র বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় "রাজলক্ষ্মী গ্রাম-সম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন। অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল।" সেই বিধবা কন্যাকেই রাজলক্ষ্মী নিজ গৃহে ঠাঁই দিলেন।

ঠিক এখানেই একটি প্রশ্ন ওঠে। একবার যার যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব

ওঠে, তাদের যদি আবার কখনো মুখোমুখি দেখা হয় তবে তাদের মানসিক কি প্রতিক্রিয়া হবে? যদি তাদের কেউ বিধবা অথবা মৃতদার হয় তবে তাদের পরস্পরের প্রতি কি মনোভাব হবে? এবং যদি তারা মৃতদার বা বিধবারূপে একই গৃহে বাস করতে থাকে তবেই বা কি মানসিক ক্রিয়া হবে তাদের মধ্যে? সম্ভবত, এরও সর্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। কিন্তু একটা তুলনা যে এদের মনে জাগবে এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। এ আমার স্ত্রী বা স্বামী হতে পারত। আজ যে আমার স্ত্রী সে যে-আমার-স্ত্রী-হতে পারত তাব তুলনায় ভাল অথবা ভাল নয়; যদি ভাল মনে হয়, তবে যে-পেয়েছে তার প্রতি ঈর্ষা হতে পারে—হয়ই। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

মহেন্দ্র বিহারীকে আশা সম্বন্ধে একখানি চিঠি লিখেছিল। সে চিঠিখানি বিনোদিনী পড়েছিল। "বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার তুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।"

বিনোদিনী আশাকে এই বলে প্রথম সম্ভাষণ কবল: "ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হ'ক, কিন্তু আমি তুঃখিনী বলিয়া আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।"

সরলা আশা বিনোদিনীকে তাদের দাম্পত্য-প্রেমের সকল কথাই বলত। "ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল।" মানুষের একান্ত অন্ধ প্রবৃত্তির আবেগ এর চাইতে সুন্দরতর শাব্দিক সজ্জায় প্রকাশ করা দুরূহ। "বিনোদিনী বুকের নিচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুনগুন-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।"

এই কি বিনোদিনীর আসল রূপ বা আসল প্রকৃতি? না, এ নিতান্তই বঞ্চনার প্রতিফল মাত্র—যা আপাতত অনিবার্য? বিহারী কিন্তু

একদিন বিনোদিনীর মানবিক স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। দমদমের বাগান-বাড়িতে বিহারী আবিষ্কার করেছিল তৃষ্ণার্ত ঈর্ষাদগ্ধ কামকম্পিত বাহ্যিক বিনোদিনীর অতিরিক্ত অন্তরের একটি বিনোদিনীও আছে। "এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধা ধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস কৌতুক বিলাসের দহন-জ্বালায় এখনো নারী প্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সতী স্ত্রী ভাবে একান্ত ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গল দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল।"...

সেই—সেই মানুষটি। রবীন্দ্রনাথ যে অন্তর্দৃষ্টি বলে সুদকামী কঠোর-মূর্তি কাবুলিওয়ালার গোপন হৃদয়স্থলে দেশে-ফেলে-আসা-মেয়ের পাঞ্জার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন, সেই দৃষ্টির সন্ধানী আলো ফেলেই তিনি সকলের অন্তর আবিষ্কার করেন।..."প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থা বিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে, সংসারের কাছে সেইটেই সত্য!" এই সত্য রবীন্দ্রনাথ মানতে রাজী নন। মানুষ যতখানি নেমে যায় যাক, যে-অবস্থায় যায়, সে-অবস্থাটিকে দূর করলে, তাকে তোলা যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে তার চাইতেও বড় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এই যে, মানুষের অন্তরেই এমন একটি দ্বন্দ্ব আছে যা তাকে আপন সত্তায় ফিরিয়ে আনে। বিহারী একদিন এই সত্যকে আবিষ্কার করেছিল এবং বিনোদিনীর প্রগল্ভ উদ্দামতার মধ্যে তার মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল।

বিনোদিনী অবস্থা বিপাকের মানুষ। আশাই তাকে বলেছিল, "একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হইলেই তো হইত।"

"তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাটতো এক দিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল।"......

সত্যিই তো, "না হইল কেন।" হ'ল তো না-ই, যে বিকল্প ঘর সে বেঁধেছিল তাও পুড়ে গেল, তার কপাল পুড়ল, বিধবা হ'ল। তাও সম্ভবত সহ্য হ'ত। এমন কেন হ'ল যে, একদিন যে-সম্ভাবনা মিথ্যে হয়ে গেছে সে সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই তাকে আসতে হ'ল? যে-ভূমিকায় তার অবতীর্ণ হওয়ার কথা, এমন কপাল কেন তার হ'ল যে, তাকে চোখ মেলে দেখতে হবে সেই ভূমিকায় আর একজন অবতীর্ণ হয়েছে—এমন একজন যে সে তার চাইতে অপটু ও অযোগ্য? কেন এমন হয় যে, কপাল পুড়তে তারই পুড়বে, কপাল খুলতে আর একজনার খুলবে? "সে যেদিকে চায়, তাহার চোখে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতে থাকে। এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি আমার রাজত্ব, এ-স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম।...আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।"

ঈর্ষা—দুর্দমনীয় ঈর্ষা। কিন্তু এখানেই বিনোদিনীর সাংসারিক ব্যর্থতার চিত্রটি বড় করুণ। সে কল্পনায় নিজেকে আশার জায়গায় স্থাপন ক'রে ক্ষণিক আনন্দ পায়, কিন্তু পরক্ষণেই সে-যে সত্য নয়, কল্পনাই, এই চেতনা তাকে আরও অস্থির আরও অসহিষ্ণু আরও কামাতুর ক'রে তোলে। নেই, নেই, সব কিছু সে হারিয়েছে। এখন তাকে যদি কিছু পেতে হয় তো সে লুণ্ঠন ক'রে, ডাকাতি ক'রে, অপরকে প্রতারিত, বঞ্চিত, পীড়িত ক'রে। তাতে কল্যাণ নেই, কিন্তু এমন জীবন যাপন করেই বা সে কি কল্যাণ পেয়েছে? শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রতারণাই তার সাময়িক অবলম্বন হয়। "অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহার স্বামী-সম্মেলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত।"

আশাকে বলে: "তোমাদের ভালবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না ভাই।"

কিন্তু বঞ্চিত জীবনের পক্ষে এ মরীচিকা মাত্র। "মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার (বিনোদিনীর) কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন।"

মহেন্দ্র যখন বাড়ী ছেড়ে আলাদা আস্তানার ব্যবস্থা করেছিল তখনই বিনোদিনীর মনে এই সব তরঙ্গ উঠতে থাকে এবং সে বলে, "সে (মহেন্দ্র) যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।"

কিন্তু এজন্য আশাকেই তার চাই। আশাকে সামনে রেখেই, তারই আড়ালে সে মহেন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে পত্রযোগে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। সচেতন মহেন্দ্রও চমৎকৃত হ'ল। উভয়ে মিলে গৃহদাহের ইন্ধন বাড়িয়ে যেতে লাগল। যিনি বহুলাংশে এই ইন্ধনবৃদ্ধির পথে বিঘ্ন হতে পারতেন তিনি, রাজলক্ষ্মী, পুত্রের এই ভ্রান্তি ও পথচ্যুতিতে পরোক্ষে সহায়তা করেছেন, তাঁর অভিমান এবং তাঁর আত্মসুখও বটে, আশাকে লাঞ্ছিত ও বিনোদিনীকে সমাদর জানিয়েছে। রাজলক্ষ্মী অন্ধ না হ'লে তিনিই বিনোদিনীকে নিরস্ত ও সংযত করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় বলেছেন, "চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রর সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন ক'রে দাঁত-নখ বের করত না।"

তাই কাহিনীর এক জায়গায় আছে ঃ "এইরূপে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা এবং মহেন্দ্রর মধ্যে নিষ্ঠুর নিগূঢ় নীরব ঘাত প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল।" আশা-মহেন্দ্রর "বিবাহ।" আশা মহেন্দ্রর কাকীমা অন্নপূর্ণার বোন-ঝি। মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী যাকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছিল সেই বিনোদিনীকে মহেন্দ্র প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরই এসেছে আশার প্রস্তাব। মহেন্দ্র বিহারীর কাঁধের সম্ভাব্য ভার নিজেই বইবে বলে এগিয়ে এল। রাজলক্ষ্মীর মনে হ'ল এ তাকেই বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র। এ সম্বন্ধ ভাঙতে চেষ্টা করলেন। মহেন্দ্র

"দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া উঠিল।" শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্রর "ইচ্ছার বেগই" প্রাধান্য পেল। বিয়ে হ'ল। আশা যখন নতুন সংসারে পদার্পণ করল তখন "তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোন কণ্টক আছে, তাহা তাহার কম্পিত কোমল হৃদয় অনুভব করিল না।"

কিন্তু শাশুড়ীর কল্যাণে এল চোখের বালি। এই নিয়ে সংসারে অনর্থ ঘটতে লাগল। কাঁটা বিঁধতে লাগল পদে পদে। অবশ্য চোখের বালি একেবারে বেপরোয়া না হওয়া পর্যন্ত আশা সে কাঁটার বেদনা অনুভব করেনি। গৃহত্যাগী মহেন্দ্রকে আশার নামে নিজের কথা লিখেছে বিনোদিনী। "আমার জন্যও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল।···ভাসিয়া আসিয়াছি, ভাসিয়া যাইতাম।" স্পষ্টতই এ আশার কথা নয়। মহেন্দ্রর বুঝতে দেরি হয়নি। তার "ভিতরে ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চার হইতে লাগিল।···এই প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত, প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল করিয়া তুলিল।" দ্বিতীয় চিঠিতে বিনোদিনী আশার নামে লিখল: "দুঃখিনীর বিল্বপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে।" তৃতীয় চিঠি আরও স্পষ্ট: "শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখো দেখি, যাহা বুঝিয়াছিলাম সে কি তুমি বোঝাও নাই।"

পত্রালাপে এই উৎকণ্ঠা এই অসংযম কিন্তু মহেন্দ্র বাড়ী ফিরে এলে বিপরীত গতি নিল। বিনোদিনী সমাজের বিরুদ্ধে, সঙ্কীর্ণতম কেন্দ্র মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে, প্রতিহিংসার ভাব পোষণ করত; তাই আশাকে ধরে রেখে "আশার স্বামী ছাদের উপরকার শূন্য ঘরের কোণে বসিয়া আকাশে ছটফট করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসি হাসিত।" বিনোদিনীর মনের বাসনা এই যে, "যাহারা তাহার সকল সুখের অন্তরায়······তাহাদিগকে পরাস্ত ধূলি-লুণ্ঠিত করিলেই তাহার ব্যর্থ জীবনের কর্ম সমাধা হইবে।"

কিন্তু ধরা সে দিবে না। প্রকৃতির অসহ্য তাড়নায় সে মরিয়া হয়ে ওঠে, সে মহেন্দ্রকে স্পষ্ট ক'রেই আহ্বান জানায়, কিন্তু মহেন্দ্র কাছে আসতেই তার সকল সমাজ-চেতনা ও নারীত্ব জেগে ওঠে। সে কি সমাজের বাইরে যাবে, সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এর নিয়ম-শৃঙ্খলা দুই পায়ে মাড়াবে? মহেন্দ্রর কাছে আত্ম-সমর্পণের অর্থ তো এই, তার প্রবৃত্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ। স্থির বুদ্ধি থাকলে মহেন্দ্র তো আশাকে নিয়েই সংসারে প্রতিষ্ঠা ও সুখলাভ করতে পারত। মহেন্দ্র তো আগুন-লাগা মানুষের মতো দাপাদাপি করতে চায়—এবং এই অস্থিরচিত্ত মহেন্দ্র তাকে একদিন অনায়াসে ফেলে যেতে পারবে। মহেন্দ্রর মধ্যে স্থিরতা নেই, ধীরতা নেই। বিনোদিনীর নারীমন প্রকৃতির মতো আকৃষ্ট হয়েও অকল্যাণকর পরিণামে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। মহেন্দ্র যে শুধুই অসংযম, সে তো বিন্দু থেকে বিন্দুতে ছুটে বেড়াবে। আজ পায়নি বলেই এই আগ্রহ। আশার জন্যও মহেন্দ্র এই অস্থিরতা দেখিয়েছে; বন্ধুকে নিরস্ত ক'রে নিজে কাঁধ পেতে দিয়েছে; দিনরাত তার সঙ্গলাভ করেছে; কিন্তু চোখের বালিকে দেখার পর সেই আসক্তির আলিঙ্গন শিথিল হয়ে গেছে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই হবে না এমন প্রতিশ্রুতি কে দেবে? সত্যি সত্যি মহেন্দ্রর জীবনেই তা হয়েছে। তারও একদিন এক সময় মোহ-মুক্তি হয়েছিল। বারে বারে কাছে টেনেও যখন বিনোদিনী ধরা দেয় না, শ্রান্ত-ক্লান্ত-পীড়িত মহেন্দ্রর মনে তখন এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, "বিনোদিনী একটি স্ত্রীলোক মাত্র, আর কিছুই নহে—তাহার চারিদিকে সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য হইতে, সমস্ত কার্য হইতে কাহিনী হইতে যে একটি লাবণ্য জ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজ মায়া-মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিতেই একটি সামান্য নারী মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তাহার কোন অপূর্বত্ব রহিল না।"

বিনোদিনী মন দিয়ে বুঝত মহেন্দ্রর একদিন মোহমুক্তি ঘটবেই, তখন মহেন্দ্রর উদ্দাম ভালবাসারও শেষ হবে।

তাই বিনোদিনী সর্বতোভাবে মহেন্দ্রকে গ্রহণ করতে পারে না।

মহেন্দ্র তার অবলম্বন। তার উষ্ণ চুম্বন স্থির-ধীর-বুদ্ধি বিহারীর জন্য উদ্যত হয়, মহেন্দ্রকে সঙ্গী ক'রে সে বিহারীকে খুঁজে ফেরে। হুবহু শৈবলিনীর মতো নয়, শৈবলিনীর উদ্দামতা তার ছিল, শৈবলিনীর মতো সংযত ধীরবুদ্ধি স্বামী চন্দ্রশেখর ছিল না, সে বিধবা, তার কোন অবলম্বন নেই। তাই বিহারীর প্রত্যাখ্যানের পর মহেন্দ্র ভালোবাসা নিবেদন করলে বিনোদিনী বলেছিল, "মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"

[illegible] ভালোবাসার কাঙাল। তবু এমন ভালোবাসা চাই যা স্থায়ী হবে। ধূমকেতুর পুচ্ছলাঞ্ছনা নয়; সে বিহারীর ভালোবাসা চায়। বিহারীর দুঃখের সীমা নেই। সে অনায়াসে আশাকে বন্ধুর অঙ্কশায়িনী ক'রে দিয়েছে কিন্তু সন্দিগ্ধ মহেন্দ্র নিজের চিত্তদর্পণে বিহারীকেও আশার প্রণয়প্রার্থী রূপে দেখেছে। বিহারী লজ্জায় পালিয়ে ফিরেছে, আর, বিনোদিনী তার পেছনে ফিরেছে। বিনোদিনীর "ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল মুখের চুম্বন-নিবেদন" বিহারীকেও কম ক্ষত-বিক্ষত করেনি। কিন্তু বিনোদিনী যেন দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন ছিল, মার আসে, লোভ আসে, মোহ আসে তার বিভ্রান্তি ঘটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই সে যেন সত্তা ফিরে পায়। তাই যে বিহারী তার লক্ষ্য ছিল, সেই বিহারী যখন বিনা শর্তে আত্মনিবেদন করল, বিনোদিনী তখন শুদ্ধতার নাগাল পেয়েছে, সে বলল, না, যে-আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে সে অনেক সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়েছে তাকে কিছুতেই পাঁকে নামানো চলবে না। দুর্দান্ত বিনোদিনীর মধ্যে এই সংযমের অভিব্যক্তি বিস্ময়কর। কিন্তু মানুষের মাহাত্ম্যে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিশ্বাস।

চোখের বালির আগে ভ্রমরা-রোহিণী-গোবিন্দলালের, প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের, কুন্দ-সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের যুগ প্রবাহিত হয়ে গেছে। সুতরাং, ভাবের দিকে চোখের বালির রবীন্দ্রনাথে সেকালের অনুস্মৃতি আছে; কিন্তু অনুস্মৃতি সত্ত্বেও একটা বলিষ্ঠ আশায় সিঞ্চিত

বলে এদের বিয়োগান্ত ঘটেনি। এখানে কাহিনী বিয়োগান্ত নয়, মৃত্যুতে নয়, হত্যায় বা আত্মহত্যায় নয়। জীবনের কোথায় ট্রাজেডি রবীন্দ্রনাথ শুধু সেইটিই দেখিয়েছেন, বাহ্যিক ট্রাজেডি দেখিয়ে কি মঙ্গল সাধিত হবে ? রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী, আশা, মহেন্দ্র, বিহারী, সকলেরই জীবন বিচ্ছিন্নভাবে বিয়োগান্তক, কিন্তু সমগ্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে ? বিনোদিনী যেখানে নিজেকে রক্ষা করল, নিজেকে সংযত করল, সেখানে সে কি মহেন্দ্রকেও রক্ষা ও মোহমুক্ত করল না ? মহেন্দ্রর মুক্তিতে কি আশার তপস্যা সার্থক হল না এবং রাজলক্ষ্মীরও ? এবং সর্বোপরি বিহারী ? বিনোদিনী আত্মনিবেদন করেছে, ভালবাসার প্রতিভালবাসা পেয়েছে, এর বেশী যদি প্রত্যাশা করত, তবে এতদিন সে যা মিথ্যা ক্ষণিক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকেই সত্য করে তুলত এবং তাতে তার সব কিছু মিথ্যে হয়ে যেত। মহৎপ্রাণ উপন্যাস লেখকের এই বৈশিষ্ট্য যে, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, সামান্যকে অসামান্য দৃষ্টিতে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। প্রবৃত্তির আগুনে দগ্ধ বিনোদিনীর মহত্ভাবটাকেই উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে বিনোদিনীকে সমাদরের শ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুলেছেন। বিনোদিনীকে আজ আমরা যত ভালবাসি এত ভাল কোন কালেই বাসতাম না। তাই এ কাহিনী বিয়োগান্ত হয়নি।

গোরা

গোরা কাহিনী-প্রধান নয়, বিতর্ক প্রধান। এর কাহিনী একেবারে শেষে, উপসংহারের মুখে।

চোখের বালির ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেনঃ "এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিইনি। ছোট গল্পের উল্কাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হ'ল এবারকার গল্প বানাতে হবে এযুগের কারখানা-ঘরে।

…এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলঙ্কারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব নষ্ট হয়। তারপর ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোট গল্পের পারকল্পনায় আমার লেখনী রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায়নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তারপরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে।”

উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-মানস খুবই স্পষ্ট। তার আঙ্গিক ত সেইভাবে স্থির হয়ে গেছে এবং

“বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল আর একদিকে এনেছিল গল্পে এমন কি কাব্যেও মানবচরিত্রের সংস্পর্শে।… সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতাতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।”

ঠিক এই দৃষ্টিতে নৌকাডুবিতে ঘটনা পরম্পরাই প্রধান। চোখের বালিতে ঘটনা পরম্পরা আছে বিশ্লেষণও আছে; গোরা বিতর্ক বা বিশ্লেষণ-প্রধান, কাহিনী অপ্রধান—যদিও উপসংহারের মুখে এই অপ্রধান কাহিনীকেই সকল বিতর্ক বিশ্লেষণ একটা নতুনতর রঙ ও ইঙ্গিত দিয়েছে; ফলে, বেদনার্ত পাঠককে আর একবার বিতর্ক বিশ্লেষণগুলো নাড়া দেয়। নৌকাডুবি ও গোরার রচনার মধ্যে, সুতরাং কাহিনীকালের প্রভাবের মধ্যে, কয়েকটি ছোটখাট আশ্চর্য মিল আছে। এই দুইটি বইয়েই প্রাথমিক পাঠ হিসেবে “চারু পাঠ” ও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের উল্লেখ আছে। এথেকে সেকালের শিক্ষিত সমাজের মোটামুটি পরিবেশ বোঝা যায়।*

* মহেন্দ্র আশাকে চারুপাঠ পড়াতো। চারুপাঠ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের পাঠ্য ছিল। তাঁর জীবনস্মৃতিতে আছে নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাশয়ের কাছে (তাকে) চারুপাঠ (ও অন্যান্য বই) পড়তে) হ'ত।

'গোরার প্রথম প্রকাশ প্রবাসী পত্রিকায়। ১৩১৪ সাল থেকে ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৯০৮ সালে সুরু হয়ে ১৯১০ সালে শেষ হয়। ৫১ বছর আগের কথা। ঐ বছরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে প্রকাশিত পাঠের বহুলাংশ প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়। আবার ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতী সংস্করণে প্রবাসী থেকে অনেক অংশ নেওয়া হয়। রবীন্দ্র রচনাবলীর সংস্করণে প্রবাসী থেকে আরও কিছু অংশ নেয়া হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিন শ' টাকা।··· লিখতে বসলুম, গোরা আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারও ফাঁকি দিইনি।"

ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন; কিন্তু হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টানসমাজ আজ যে মানসিকতায় এত উন্নত তার মূল কারণই হচ্ছে এই যে, যেখানে মানবতার সর্বশেষ মূল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেখানে এই সমাজ কয়টি আত্মবিশ্লেষণে কুণ্ঠাবোধ করেনি, এক শ্রেণীর গোঁড়া আপনি-মোড়ল সমাজরক্ষকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমগ্র সমাজ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। গোরা বইয়ে বা কাহিনীর অবতারণায় এই সব সামাজিক প্রশ্ন আছে এবং উঠেছে; কিন্তু তাতে যদি কোথাও বুদ্বুদ উঠে থাকে তবে কালক্রমে সমাজে তা প্রশ্রয় পায়নি। ৫১ বছরের পট-ভূমিকাকে যদি আর ৪৯ বছর পিছিয়ে নেয়া যায় তবে আমরা শতাব্দীর চিত্রটি হুবহু উপলব্ধি করতে পারি। এই শতাব্দীর সূচনা বিন্দুতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রমানসে বিগত অর্ধ ও চলতি শতাব্দীর সমাজচিন্তা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। একটি প্রশ্নসূচক কাহিনী বা জীবনী অবলম্বনে গোরার এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সমাজের আবির্ভাব।

সে কালটা কেমন? সেকালে অভিজাতবর্গের মধ্যে মোটরগাড়ীর

প্রচলন হয়নি। যানবাহনের আভিজাত্য ঘোড়ার গাড়ীতে। শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরা "যদিও নব্যদলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তবু প্রবীণা গৃহিণীরা তাহাকে নিতান্তই খৃষ্টানি বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন।" আর শতাব্দী পরে আমরা যখন লিখতে বসেছি তখন প্রবীণা গৃহিণীরাই শেমিজ আঁকড়ে আছেন, নবীনারা তা সর্বাংশে অগ্রাহ্য করেছেন।

গোরার ভাষা চোখের বালির তুলনায় অনেক উন্নত ও "রাবীন্দ্রিক।" এর সংলাপও চলতি ভাষায়। এবং বলেছি, এর আখ্যানভাগ ও ক্লাইম্যাক্স উপসংহার মুখে। কৃষ্ণদয়াল মুমূর্ষু, গোরা হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত, এমন সময় গোরার কাছে গোরার পরিচয় প্রকাশের আহ্বান এল। এই ক্লাইম্যাক্স বা উপসংহার যেন একটা আর্তনাদের মতো। গোরার কাছে শ্রাদ্ধাধিকারের প্রশ্ন উঠতেই একটা হাহাকার যেন শব্দ-রূপ পেল।

"আমি ওঁর পুত্র নই।"

"না।"

"তুমি আমার মা নও?"

"আনন্দময়ীর বুক ফাটিয়া গেল—তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি, বাবা।"

এর আগেও আনন্দময়ীর বুক ফেটেছে কিন্তু মুখ ফোটেনি; তাই গোরার জীবনে কোন আঘাত দূরস্থান, কোন সংশয়ের বাষ্পমাত্রও জমেনি। আজ যখন মুখ ফুটল তখন আনন্দময়ীর কথাগুলো নিতান্ত কথাই শোনালো; কেননা কথা যত কোমল হোক, স্নেহরসসিক্ত হোক, এই কঠোর সত্য কিছুতেই ঢাকা যায় না যে, এতদিন সে যাঁকে মা বলেছে তিনি মা নন, এতদিন যাঁকে পিতা বলে জেনেছে তিনি পিতা নন। গোরার সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত অস্তিত্ব দুলে উঠেছে, পায়ের তলায় মাটি নেই, সে একান্ত বায়ুভূত নিঃসঙ্গ। এবং সব চাইতে বড় কথা, এতদিন সে যে-দেশের গৌরব, জাতির গৌরব, ধর্মের গৌরব, সমাজের

গৌরব ক'রে এসেছে সে সকলই মিথ্যা ; এই মিথ্যার পিছনে অন্ধবিশ্বাসে ছুটে আর এতখানি জীবনও তো তবে মিথ্যা হ'য়ে গেছে! "তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই দেবতা নাই। তাহার সমস্তই একটা কেবল 'না'।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যদি উদার এবং মানবিকতার ভাবে মহৎ না হ'ত, তবে যে-কোন প্রাচীন বা নবীন সাধারণ ব্যর্থ লেখকের মতো এখানে তিনি গোরাকে নিয়ে একটা অশুভ মারাত্মক কাণ্ড ক'রে বসতেন। কেননা, সাধারণের মনে এর পর জীবনের আর কি মূল্য থাকতে পারে? এমন নামগোত্রহীন জীবনের অবসানই ভাল।

কিন্তু বলিষ্ঠ আশাবাদ না থাকলে রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ হতেন না। আগাগোড়া তিনি গোরাকে বলিষ্ঠ করেই গড়েছেন ; তার বিস্তৃত বক্ষ ও নির্ভরযোগ্য কাঁধের পক্ষেই এই আঘাত সহ্য করা সম্ভব। তাই তার স্রষ্টা প্রথম সস্নেহ আলোকপাত করলেন। কৃষ্ণদয়ালের শুচিতার বাড়াবাড়ি তাকে বরাবর পীড়িত করত, যুক্তি ছাড়া "পিতা-পুত্রের" মধ্যে কোন স্নেহবন্ধনই ছিল না। তাই তার জীবন যখন সকল কিছু 'না' হয়ে গেল, তখন প্রথম "কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই ইহা স্মরণ করিয়া সে আরাম পাইল।"

তাই ব'লে সে জীবনকে একেবারে নোঙরহীন করল না। যে-কোন ক্ষুদ্রদৃষ্টি লেখক তাই করতে পারত, হতাশায় সবরকমে অসামাজিক ও ভ্রষ্ট হ'তে পারত। কিন্তু গোরাকে সে ধাতুতে গড়া হয়নি। গোরা সেই সৌম্য প্রকৃতি কল্যাণ চিন্তায় উৎসর্গীকৃত জীবন পরেশবাবুর কাছে গিয়ে বলল, "পরেশবাবু, আমার কোন বন্ধন নেই।...আজ আমি মুক্ত।" //

যত সময় যাচ্ছে ততই তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হচ্ছে। সে দৃঢ়কণ্ঠে কিছুকাল আগেও যা শূন্য এবং কেবলমাত্র একটা 'না' ছিল তাকে পূর্ণ করল, তাকে মূর্তি দিল : "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দুমুসলমান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ

এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।”

আজ থেকে ৫১ বছর আগে। আজ যখন সারা ভারতবর্ষে বাংলার অধিবাসীরা সর্বত্র লাঞ্ছিত, অনাদৃতও অবাঞ্ছিত এবং অযথা নিন্দার কাদায় সর্বাঙ্গ লিপ্ত, তখন সারাভারতের দৃষ্টিতে একথা মূল্য-হীন। কিন্তু এই উদার আহ্বানই সেদিনকার বাঙালী পাঠককে নাড়া দিয়েছে।

পরেশবাবুর কাছে গোরা আরও নিবেদন করল ঃ “আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, ভারতবর্ষের দেবতা।”

একদিন বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষই তাদের কাছে ধর্মের চাইতে বড় দেবতাস্বরূপ ছিল—সে দেবতার বেদীমূলে প্রাণ-বিসর্জনেও তারা কুণ্ঠা বোধ করেনি। তবে একথা সত্য যে, এই আবেদন মুসলমান সমাজে সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তারা ভারতবর্ষকে স্বদেশ ব'লে গ্রহণ করতে পারেনি।

সম্ভবত সেকালে গোরার মতই নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর দরকার ছিল, যার বাপ মা, নাম গোত্র, ধর্ম-সম্প্রদায়ের বন্ধন নেই ; বন্ধন একমাত্র দেশজননীর—যারা দেশকে শুধু মাটি নয়, মা বলে শ্রদ্ধা করে, বিদেশীর শৃঙ্খলে বন্দিনী এই মাকে যারা সর্বস্ব পণ করে মুক্ত করতে চায়। গোরা সেই সন্ন্যাসীদলের প্রতীক।

মনে রাখতে হবে কালটা ১৯০৮-১০ সাল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী ও বিদেশী বর্জনের ঢেউ চলেছে। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর আত্মবিসর্জন ঘটে গেছে, মাণিকতলা বোমার মামলা, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, স্বদেশী ডাকাতি ইত্যাদিরও সে মরশুম।

গোরার মধ্যে তার স্পর্শ-আছে, তার মন্ত্র আছে,—এবং সকল দুঃখকে উত্তীর্ণ হওয়ার অবিচল বলিষ্ঠ-আশাবাদ আছে।

কাহিনীর দিক থেকে গোরার প্রকৃত পরিচয় পাঠকের কাছে আকস্মিক নয়, তার কাছে এর লজিকটাই অনুসরণীয়। লেখক বহুবার পাঠকের কাছে এ ইঙ্গিত রেখে গেছেন যে, গোরা হিন্দু সমাজের নয়, গোরার পিতামাতা কৃষ্ণদয়াল আনন্দময়ী নন। গোরা গোরাই তার এই ধর্মাচরণ ও বিতর্ক অজ্ঞান অচেতন মনের। তার কাছে পরিচয় উদ্‌ঘাটনের পর তার যে জীবন সে জীবন জ্ঞানের, সে জীবন সচেতন। আনন্দময়ী গোরাকে বলেছিলেন, "তুই যা করছিস তা জ্ঞানে করছিস নে, তা আমি তোকে বলে দিলুম।"

আনন্দময়ীর কথাগুলো এমনই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক যে, গোরার মনে কখনো সংশয় জাগেনি। সে মনে করেছে মা'র এসব স্নেহের কথা অথবা সংস্কারের কথা। গোরা "খ্রীষ্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় ক'রে দিলে" আনন্দময়ীর ঘরে তার খাওয়া চলবে না একথা বললে, আনন্দময়ী বলেছিলেন, "আমি যদি খ্রীষ্টান বলে ছোটো জাত বলে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন।" পাঠকের কাছে এ ইঙ্গিত মোটেই ধোঁয়াটে নয়, কিন্তু গোরার কাছে? তার কাছে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মা ঐ কাজটাকে পাপ মনে করেন এবং ভয় করেন ঐ পাপে তার সন্তানকেও হারাতে হবে। তার বন্ধু বিনয়ের মনে একটা "অস্পষ্ট সংশয়ের আভাস দেখা" দিয়েছিল, কিন্তু তা কখনও স্পষ্ট নিঃসংশয় ও প্রত্যক্ষ হ'য়ে দেখা দেয়নি। গোরাকে একবার বলেছিল, "মা যেন কিসের জন্য একটা ভাবনা পুষে রেখেছেন।" কিন্তু এর বেশী নয়, কেননা, গোরা একথায় কোন আমল দেয়নি। গোরার এই সব কথায় কান দেবার মতো অবস্থাও ছিল না; সে ভাবাকাশে বিচরণ করত; তার কাছে বাস্তবের চাইতেও সেই ভাবই বেশী সত্য।

সেই ভাব হচ্ছে ভারতবর্ষের ধ্যান, ন্যায়-অন্যায়ের ভাল-মন্দর

সর্বাত্মক ভারতবর্ষ। "সবই ভালো, যাহাকে দোষ বলিতেছে, তাহা কোনো একভাবে গুণ, ইহা যে গোরা কেবল উকিলের মতো প্রমাণ করিত তাহা নহে, ইহাই সে সমস্ত মন দিয়া বিশ্বাস করিত।"

যে বলত: "ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মূর্তিটা সবার কাছে তুলে ধরো—লোকে তাহলে পাগল হয়ে যাবে।...প্রাণ দেবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।" সে বলেছে; "এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশী, তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া।"

আবার সেই কালের কথা স্মরণ করতে চাই—যে কালে গোরার এই কথাটির একটি বিশেষ মূল্য ছিল। দেশকে ঐ রকম নিঃসংশয়ে সর্বতোভাবে ভালবাসতে না পারলে, দেশের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলে দেশোদ্ধারে সর্বস্ব পণ করবে কে? সে কালে যদি এই প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়ে একদল মানুষ এ বাংলাদেশে না বেরোত তবে দেশ-প্রেমের কোন মর্য্যাদাই হ'ত না। গোরার মতো অনেকেই সেকালে "রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।" এর প্রয়োজন ছিল। সেদিন বিদেশী শাসক-প্রতিভূদের উদ্দেশে একটা ছোট ঢিলও উল্লেখযোগ্য ছিল। ভুল হোক যাই হোক, ক্ষুদিরামের লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসক, শাসকশ্রেণীর পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। বাঘা যতীনের বাঘমারা নয়, সাহেব-মারার, নৈতিক দৃষ্টান্তেই ছিল তখন কাম্য। দুর্ধর্ষ, দুর্মদ, দুরন্ত, কৃচ্ছ্রসাধক, কষ্টসহিষ্ণু, মৃত্যুভয়হীন মহৎ ভাবোদ্দীপ্ত দেশপ্রেমিকেরই সেদিন প্রয়োজন ছিল। "সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা।" ৫১ বছর আগে এর মূল্য ছিল। আজ নেই। আজ দেশকে বিচার বিশ্লেষণের সময়, নির্বিচারে সব কিছু ভালো বলার সময় আজ উত্তীর্ণ।

গোরার পারিবেশটি কেমন? এককালে অনাচারে অভ্যস্ত "পিতা"

গৃহে "সাধনাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেছেন, অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ হয়েছেন। এককালে আচার-বিচারে অভ্যস্ত "মা" এমনই আচারমুক্ত হয়েছেন যে খ্রীষ্টানী লছমিয়ার হাতে জল খেতে তাঁর বাধে না। "পিতা" কৃষ্ণদয়ালের পশ্চিম সফরকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোন এক পালানো মেমের গর্ভে যে গোরার জন্ম সে গোঁড়া হিন্দু হ'য়ে উঠেছে এবং তার বন্ধু বিনয়কেও সে গোঁড়ামির কাছে নতি স্বীকার করিয়েছে।

বিনয়সহ এই হিন্দু পরিবারের সঙ্গে প্রথম সংঘাত ঘটল পরেশবাবুর ব্রাহ্মপরিবারের। এবং সে সংঘাত ঘটল প্রেমের মধ্য দিয়ে। গোরার বন্ধু বিনয়ের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ছিল না। যতদিন গোরার প্রভাব ছিল ততদিন সে গোরাময় এবং গোরার কথার প্রতিধ্বনি। কিন্তু যখন পরেশবাবুর বাড়ীর সুচরিতা ও লীলার সঙ্গে এবং কিছুকাল সমগ্র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল তখনই লাগল বিরোধ। ব্রাহ্ম-বাড়ী আনাগোনা গোরার মনঃপূত নয়। বন্ধুত্ব :শিথিল হ'তে লাগল। কিন্তু গোরাও যেদিন থেকে সুচরিতার সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল সেদিন থেকে তারও মনে লাগল আর এক সংঘাত। এককালে স্বদেশ-ভক্তির ক্ষেত্রে নারীর কোনো স্থান ছিল না, নারীবর্জনই ছিল রীতি। কেবল ব্রাহ্ম ব'লে নয়, নারীসংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়াও গোরার আচরণের অঙ্গ ছিল। তাই বিনয়ের পরিচয় যেমন ক্রমশ লীলার সঙ্গে তার পরিণয়ের দিকে এগিয়ে গেল, গোরার সঙ্গে সুচরিতার পরিচয় অনুরূপ পরিণতির দিকে গেল না। একদিন সুচরিতার কাছে গোরার ভাবটাই এত বড় হ'য়ে উঠল যে, গোরাকে তার বিদেহী অলৌকিক অস্তিত্ব ব'লে মনে হ'ল! গোরা তার কঠোরতা থেকে অনেকখানি নেমে এসেছিল বটে কিন্তু সে আত্মনিয়ন্ত্রণের হালটি ছাড়েনি। তার স্বভাবের প্রয়োজনেও বটে, কাহিনীর প্রয়োজনেও বটে, জেলে যাওয়ার জন্য সেকালের প্রায়শ্চিত্তের কথাটা এসেই পড়ল। এবং এই প্রায়শ্চিত্তই ঘটনা ও কাহিনীর মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল।

বিনয় অতি সাধারণ ছেলে এবং তার পরিণতিও সাধারণ; কিন্তু এই পরিণামে পৌঁছোতেও তাকে অনেক দাম দিতে হয়েছে, বারংবার ছোটখাট ঘটনায় প্রমাণ দিতে হয়েছে যে, তার আর ললিতার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে চাইছে তা প্রগল্‌ভ প্রকৃতিমাত্র নয়। একই স্টীমারে ললিতাকে নিয়ে বিনয় এসেছে, সেখানে নিদ্রিতা লীলাকে পাহারা দিতে দিতে বিনয় প্রবৃত্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পরেশ-বাবুও যতদিন না নিঃসংশয় হয়েছেন যে, বিনয় ললিতার এ নিছক জৈবিক আকর্ষণ নয় ততদিন সম্মতিদান স্থগিত রেখেছেন, এবং যেইমাত্র নিঃসংশয়ে সম্মতি দিয়েছেন, অমনি স্ত্রীর সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য দ্বন্দ্বে প্রস্তুত হয়েছেন যে, ব্যক্তিপেষণ নয়, ব্যক্তি-পোষণই সমাজের কাজ। এ কাজ না করলে সমাজের ধর্মও মিথ্যা।

বিনয় থেকে ভিন্ন প্রকৃতির গোরা তা বুঝেছিল। তাই সে ললিতার প্রতি বিনয়ের প্রেমকে লক্ষ্য ক'রে বলেছে: "তুমি এতদিন বই পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বই-পড়া স্বদেশ-প্রেমকেই জানি—প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ তখনি বুঝতে পেরেছ বইয়ের জিনিসের চেয়ে এ কত সত্য—স্বদেশ প্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীনভাবে প্রত্যক্ষ গোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নাই।"

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব। যে-কোন জিনিসকে তিনি এক উচ্চগ্রামে তুলে ধরতে পারেন; অথচ কোনটাবই অস্বীকৃতি নেই, ক্ষুদ্র প্রদীপেরও নয়, সূর্যেরও নয়। নারী প্রেমও নয়, স্বদেশ প্রেমও নয়। আজ পর্যন্ত অস্বীকার করবার কারণ ঘটেনি যে, স্বদেশ প্রেম নারী প্রেম অপেক্ষা মহত্তর। অথবা বিনয়ের প্রকৃতির পক্ষে যা সত্য, গোরার প্রকৃতির পক্ষে তা সত্য নয়। আপন আপন ক্ষেত্রে উভয়ই সুগভীর সত্য। বিনয়ের প্রেম যেখানে ললিতাতেই শেষ, গোরার প্রেম সেখানে সুরুচিতায় শেষ হ'তে পারে না—তাকে অর্থাৎ ব্যক্তিকে

ছাড়িয়ে যেতে হবে। সুচরিতা তা জানত, সেও গোরাকে টেনে তার সীমায় আবদ্ধ রাখতে চায়নি; বরং গোরার কথার সে প্রতিধ্বনি হ'য়ে গেছে। সে তার ছোট ভাইকে (নিজেকে বোঝাবার জন্য) বলছে ঃ "আমাদের যে-দেশ, আমাদের যে-জাত, সে কত বড়ো তা জানিস? এ-এক আশ্চর্য দেশ। এই দেশকে পৃথিবীর সকলের চূড়ার উপরে বসাবার জন্যে কত হাজার হাজার বৎসর ধরে বিধাতার আয়োজন হয়েছে, দেশবিদেশ থেকে কত লোক এসে এই আয়োজনে যোগ দিয়েছে, এদেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাকাব্য এইখান থেকে বলা হয়েছে, কত মহাতপস্যা এইখানে সাধন করা হয়েছে, ধর্মকে এদেশ কত দিক থেকে দেখেছে এবং জীবন সমস্যার কত রকম মীমাংসা এই দেশে হয়েছে। সেই আমাদের ভারতবর্ষ!"

সব ব্যক্তি একাকার হ'য়ে গেছে। সব সীমা ধুয়ে মুছে গেছে। বিনযের সম্মুখে উন্মুক্ত পথ ললিতাদের বাড়ী অবধি; হিন্দুত্বের প্রাচীর তাকে রোধ করতে পারে নি। ললিতার পথও উন্মুক্ত তারও সমাজের প্রাচীর নিশ্চিহ্ন। গোরার পথও আজ পরেশবাবু-সুচরিতার বাড়ীতে সংযুক্ত, গোরার হিন্দুয়ানী বা সুচরিতার সমাজ-আনুগত্য কোনো বাধা তো সৃষ্টি করতে পারে নি। সর্বশেষ গোরার চারদিকে যে আচারের বাধা ছিল, বাবা-মা'র বাধা, হিন্দুসমাজের বাধা তাও ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তি ঘটল। সকল অভিমানের কাঁটা উপেক্ষা করে গোরা প্রসন্ন মনে পরেশবাবুর ছায়ায় এসে মিশল যে-পরেশবাবু বলেন ঃ "আমি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে জানি। ব্যক্তির সেই স্বাধীনতার দ্বারা আঘাত করেই আমরা জানতে পারি কোনটা নিত্য সত্য, আর কোনটা নশ্বর কল্পনা—সেইটে জানা এবং জানার চেষ্টার উপরই সমাজের হিত নির্ভর করছে।"

গোরাকে সর্বরকমে মুক্ত ক'রে স্বদেশ কল্যাণের প্রতীকরূপে উপস্থিত করা হয়েছে, সুচরিতায় সেভাব সঞ্চারিত হয়েছে, কিন্তু ব্যক্তি চেতনা হারায় নি।

ঘরে বাইরে

ঘরে বাইরে সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা থিওরী আছে। কিন্তু সে-কথা পরে। তার আগে আর যে ক'টি সম্ভাব্য তত্ত্ব হ'তে পারে তাই যাচাই ক'রে দেখি। ঘরে বাইরে অর্থ স্রেফ ঘরে আর বাইরে হ'তে পারে। ঘরের সীমাবদ্ধতা সঙ্কীর্ণতা বাইরে হয় সীমাহীন উদার। ঘরে নিরাপদ বাইরে বিপদ। ঘরের চারদিকে প্রাচীর, নানারকম সংস্কারের বন্ধন, এখানে গৃহদেবতার প্রাধান্য, ঘরে অবগুণ্ঠিত বধূ। বাইরে প্রাচীর থাকে না, সংস্কার বারে বারে ঘা খায়, গৃহদেবতার উৎপাত নেই, এখানে সকলেই অনবগুণ্ঠিতা। ঘরে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা; বাইরে সংগ্রাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরাক্রম। কিন্তু ঘরে বাইরের লোককে প্রবেশাধিকার দিলে ঘরের শান্তি বিঘ্নিত, সম্পদ অপহৃত ও লুণ্ঠিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘরে বাইরে নিখিলেশদের পরিবারে নিখিলেশের সঙ্গে তার বৌদিদের সম্পর্ক ও পরস্পরের স্থান, নিখিলেশের সঙ্গে তার স্ত্রী বিমলার সম্পর্ক, স্ত্রীকে বাইরে পরিচিত করার জন্য নিখিলেশের উৎকণ্ঠা, বিমলার প্রাথমিক কুণ্ঠা, সন্দীপের আবির্ভাব ও বিমলার চিকের আড়াল সরিয়ে তাকে দেখা, নিখিলেশকে এড়িয়ে সন্দীপ বিমলার নতুন সম্পর্ক, মেজবৌদির উদ্বেগ, সন্দীপের হাতে বিমলার সর্ববিধ লাঞ্ছনার উপক্রম, গৃহের সম্পদ লুণ্ঠন—মিলিয়ে দেখতে হবে।

অথবা ঘর মানে মানুষের অন্তর, বাইরে মানে মানুষের বাইরে যা আভাসিত বা প্রকাশিত। যা আভাসিত বা প্রকাশিত তা সর্বদা ও সর্বথা সত্য নয়, তার অন্তরালে অন্তরের বস্তুই সত্য। প্রায়ই বাইরের আচরণ দেখে আমরা মানুষকে অবিচার ক'রে থাকি, ঘরে সে মানুষটি পৃথক, এমন কি বিপরীত। দীর্ঘকাল ধরে যাকে আমরা দুষ্কৃতকারী বলে জানি তাকে অকস্মাৎ আমরা সাধুরূপে পাই, তার

মানে ঘরে বা অন্তরের মানুষটি বাইরের বা প্রকাশিত মানুষটির সঙ্গে এতদিন পেরে উঠছিল না, আর ঘর বাইরেকে পর্যুদস্ত করেছে। সন্দীপের পূর্বাপর চরিত্রে এটি স্পষ্ট। দেখা গেছে সন্দীপ বা বিমলা যখন নিখিলেশের আড়ালে বাহ্যত একটা প্রচণ্ডতম অন্যায়ের সীমায় পৌঁছে গেছে, বিমলার সকল গর্ব গৌরব ধ্বংসোন্মুখ, তখনই হয় সন্দীপ নয় বিমলা আত্মসম্বরণ করে পিছিয়ে গেছে, অন্তর বা ঘর হয়েছে সত্য।

এই দুটো সম্ভাব্য তত্ত্বের মাপকাঠিতে নিখিলেশের কথাগুলো মিলিয়ে দেখা যায়। নিখিলেশ বিমলাকে বলছেঃ "আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেন'পাওনা বাকী আছে।" বিমলা বলেছিল, "কেন ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হ'ল কোথায়?" নিখিলেশ জবাব দিয়েছিল, এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।...এই ঘর-গড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরণাটুকু ক'রে যাওয়ার জন্যে, তুমি হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"

এই নিদারুণ পরীক্ষা। বিমলা বলছে তার বাইরের প্রথম পুরুষ "কাল-পুরুষের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল (কেননা, বিমলা তখন বক্তৃতা শোনার ঝোঁকে চিক সরিয়ে ফেলেছে, ঘরের আর বাইরের যে ব্যবধান তা অপসৃত হয়েছে, সে একমন হয়ে শুনছে সন্দীপের আহ্বান) ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চায় না—বজ্রের উপর বজ্রগর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি।" সন্দীপের ক্ষেত্রে 'ইন্দ্র' কথাটি ভারী মানানসই হয়েছে। ইন্দ্রের কামনা এবং ইন্দ্রের দেবত্ব দুইই প্রকাশ পেয়েছে সন্দীপের মধ্যে এবং বিমলা শেষ পর্যন্ত বিপদোত্তীর্ণ হয়েছে।

ঘরে বাইরে নিয়ে প্রবল বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও সেই বিতর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অন্ত

কোনো তত্ত্বে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোও জেনে নেয়া দরকার।

ঘরে বাইরে ৪৫ বছর আগে বাংলা ১৩২২ সালে বৈশাখ থেকে ফাল্গুন মাস অবধি সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়, ১৩২৩ সালে তা গ্রন্থাকার পায়। ইংরেজী ১৯১৬-১৭; অর্থাৎ তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে এবং গুপ্ত রাজনৈতিক হিংস আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়াবার চেষ্টা চলেছে। বাংলায় স্বদেশী ভাব চলছে। ১৩২২ সালেই সবুজপত্রের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

"যে-কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে, সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি না-পারি, একথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে। আমি বলছি এ কাজও শিল্পকাজ ; শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুনছে, সেই তার সৃষ্টি, আমি তার থেকে যদি কিছু আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারই। আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে-সব রেখাপাত করেছে, ঘরে-বাইরে গল্পের মধ্যে তার ছাপা পড়েছে। কিন্তু 'এই ছাপার কাজ শিল্পকাজ।"

আরও এক জায়গায় ঃ

"ঘরে বাইরে নভেলে যখন সন্দীপের অবতারণা করিয়াছিলাম তখন মুহূর্তের জন্যও আশঙ্কা করি নাই যে সেটা লইয়া আমাদের দেশের উপাধিধারী এত গণ্যমান্য লোকের কাছে আমার এমন জবাবদিহির দায়ে পড়িতে হইবে।···আমার সন্দীপ সীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা সন্দীপের যোগ্য—অতএব সেকথা অন্যায় কথা বলিয়াই তাহা সংগত হইয়াছে। এবং সংগতি সাহিত্যে নিন্দার বিষয় নহে।"

বাস্তবিক, সাহিত্যে মূর্খ পণ্ডিতদের নিয়েই যত বিপদ। তারা কোনো কাহিনীর চরিত্র বিশ্লেষণে, কাহিনীর মধ্যে সেই চরিত্রের অবস্থান,

সমগ্র কাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার না করতে পেরে কাহিনীর বাইরে লেখককে নিয়ে পড়ে এবং সাহিত্য বিচারে সমাজ-বিচারক হয়ে বসে। আধুনিক উপন্যাসগুলোর অনেকগুলিই আদালতে বা সমাজ নেতাদের রায়ে নয়, সাহিত্যে রসের এবং মহৎ সৃষ্টির বিচারেই অগ্রাহ্য হ'য়ে যাচ্ছে। সন্দীপের মতোই তাদের কাল, সময়, আয়ু—সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সন্দীপের পাশে নিখিলেশও তো আছে এবং সে-ই চিরকালের জন্য গ্রাহ্য ও সমাদৃত আছে।

এবার আমার থিওরীটা বলি।

নারী-প্রকৃতি দুইটি উপাদানে গঠিত; একটি উদ্দামতা, আর একটি সংরক্ষণশীলতা।* উদ্দামতা জীবনপ্রবাহের একটি মূল নীতি, এরই ক্রিয়ায় জীবজগতের অবিচ্ছিন্নতা বা বংশরক্ষা হয়ে এসেছে। ভবিষ্যৎ বংশ সুনিশ্চিত করার জন্য তারা পুরুষের মধ্যেও এই উদ্দামতা খুঁজে ফেরে। উদ্দাম আবেগপ্রবণ পুরুষ যদি সমাজের নিয়মে পাওয়া যায় ভাল, নতুবা তার একটি সন্ধানী চক্ষু বাইরে থাকে। সেখানে সমাজের সীমা তাকে বাঁধতে পারে না। নিতান্তই যদি সে বাঁধা পড়ে, তবে সে ঘরে শান্তি বিঘ্নিত করে, নতুবা আত্মপীড়ন করে। এই ব্যাপারে সে উপেক্ষিত অনাদৃত হ'তে চায় না। অনেকের অজ্ঞানে বহু সংসারে এই একটি মূল কারণে অশান্তি স্থায়ী বাসা বাঁধে এবং কিছু অনাচারও ঘটতে থাকে। যাকে বলা যায় misalliance.

কিন্তু নারী প্রকৃতির এইটিই একমাত্র উপাদান নয়। হুলো বিড়াল বা বাঘের সঙ্গে বিড়ালী বা বাঘিনীর ক্ষণিক সংযোগেই সে-প্রকৃতি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। সে তার গর্ভে যে ভবিষ্যৎ বংশধরকে ধারণ করে তাকে সে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে চায়। এ জন্য নীড় চাই, বাসা চাই, আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই, রক্ষাব্যবস্থা চাই। কিন্তু একাজ

---

* মেটাবলিজ্‌ম-এর দৃষ্টিতে পুরুষ ক্যাটাবলিক, মেয়েরা এনাবলিক। পুরুষের ধ্বংসে আনন্দ, মেয়েদের সংরক্ষণে আনন্দ; পুরুষেরা বিলোয়, মেয়েরা কনসার্ভ করে; গর্ভধারণ তার স্বভাবে নিহিত।

উদ্দাম প্রকৃতির নয়। এজন্য ধৈর্য ও স্থির মতি এবং সংরক্ষণশীল মনোভাব চাই। দুর্মদ প্রকৃতি যেমন নিজেকে নির্বিশেষে ছড়িয়ে নিঃশেষ করতে চায়, সংরক্ষণশীলতা চায় না, সে চায় যা পাওয়া গেল তাকে যত্নে রক্ষা করা, পুষ্ট করা, পূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করা। পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি স্নেহ একমাত্র এই উপাদান থেকেই উৎসারিত হ'তে পারে। উদ্দামতা যেন প্রবল বন্যার ধ্বংসরূপ নিয়ে আসে, প্রান্তরভূমি যেন দলিত মথিত করে যায়, কিন্তু বন্যাশেষে যে পলি দেখা যায়, তাতে ফসল জন্মায় ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যেই এই উদ্দামতা ও সংরক্ষণশীলতা রয়েছে। নারী প্রকৃতির প্রতীক এবং তারও মধ্যে এই প্রকৃতির লীলা রয়েছে। যদি এমন সম্ভব হয় যে, একই পুরুষের মধ্যে এই দুইটি উপাদানের আবেদনই সার্থক, তবে বাইরের আকর্ষণ গৃহস্থবধূকে ঘর-ছাড়া করে না। সে নিজের কেন্দ্র থেকেই বাইরেটা উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এমন সুন্দর যোগাযোগ হয় না। উদ্দামতা ও সংরক্ষণশীলতার অনুপাত প্রায়ই একই পুরুষের মধ্যে সমান সমান থাকে না ; কমবেশী থাকে এবং এই কমবেশীর অনুপাতেই ঘরে শান্তি বা অশান্তি থাকে ও নারীর সেই অনুপাতেই ঘরে বা বাইরের আকর্ষণ ঘটে থাকে। যে ক্ষেত্রে একটি জিনিসের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে থাকে সেখানে বিপর্যয়েরও অবধি থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' তার একটি প্রথম দৃষ্টান্ত। এখানে চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী আর প্রতাপ। চন্দ্রশেখর পণ্ডিত মানুষ ; সৎবুদ্ধি বা ধীরতার প্রতীক। কিন্তু শৈবলিনী যদি লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে সন্ধ্যেবেলায় পুকুর থেকে দেরিতেও ফেরে, চন্দ্রশেখরের চিত্তে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না বা একবার শৈবলিনীর সৌন্দর্যের দিকে চেয়েও দেখে না। এই উদাসীন সন্ন্যাসীকে নিয়ে শৈবলিনীকে ঘরে থাকতে হবে ? তাই তার উদ্দাম প্রতাপের কথা মনে পড়ে। আকস্মিক নয়। কিন্তু চন্দ্রশেখরে যদি প্রতাপের উদ্দামতা থাকত তবে সেই ছেলেবেলাকার

প্রণয়াস্পদকে সে অনায়াসেই বিস্মৃত হতে পারত। চন্দ্রশেখরের ঔদাসীন্যে এ বিস্মৃতি অসম্ভব। সে নিজে যেচে অপহৃতা হ'ল—উদ্দেশ্য, প্রতাপের সঙ্গে মিলন। আর চন্দ্রশেখর? জ্যোৎস্না-স্নাত শৈবলিনীর মুখমণ্ডল দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং স্বীকার করলেন, তাকে এ ঘরে আনা ঠিক হয় নি। তারপর যখন শৈবলিনীর অপহরণের সংবাদ পেলেন তখন পাণ্ডিত্যের পুথিপত্র আগুনে নিবেদন করলেন।

শৈবলিনীর অভিসারও সার্থক হয় নি। কেননা, শৈবলিনীর নারীত্ব কেবল প্রতাপকে নিয়ে চিরকাল সুখী হতে পারে না। তার চন্দ্রশেখরকেও চাই। সেই বীরবুদ্ধি সংযত চন্দ্রশেখর। প্রতাপের ভূমিকা যেখানে শেষ চন্দ্রশেখরের ভূমিকা সেখানে আরম্ভ। কিন্তু সে যখন একবার বাইরের আকর্ষণে ঘর ছাড়া হ'ল তখন তার ঘর পুড়ে গেছে। শৈবলিনী অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থ হ'ল।

নিখিলেশের আদর্শস্নিগ্ধ উদাসীন ভঙ্গী চন্দ্রশেখরের সঙ্গেই তুল্য। সন্দীপের সঙ্গে প্রতাপের। এই প্রতাপকেই (বা সন্দীপকেই) বিমলা ঘরের চিক সরিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখেছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু যখনই লক্ষ্য করেছে সন্দীপ কেবলই উদ্দামতা, লালসার স্থূল প্রতিমূর্তি, এ কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, কোন কিছুতেই গভীর বিশ্বাস নেই, এর পক্ষে সংগঠন সংরক্ষণ অসম্ভব তখনই সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে, পশ্চাদপসরণ করেছে। সন্দীপ এরই নাম দিয়েছে হিপনটিজম—মোহ। কিন্তু মোহই নারীর একমাত্র প্রকৃতি বা একমাত্র উপাদান নয়। বিমলাও যেদিন সে কথা বুঝল সেদিন নিখিলেশ আহত। নিখিলেশের বিদেহী ভাবটাই সেখানে অক্ষয়।

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের মহিম-অচলা-সুরেশেও এই কথারই পুনরাবৃত্তি। সেখানেও বাইরের আকর্ষণে গৃহদাহ হয়েছে। মহিমও চন্দ্রশেখর-নিখিলেশের গোত্রান্তর্গত, অচলা শৈবলিনী-বিমলার এবং সুরেশ (ইন্দ্র ?) প্রতাপ-সন্দীপের। ঘরে বাইরের প্রত্যেক সংলাপ, প্রত্যেক উক্তির রেখায় রেখায় যদি এ তত্ত্ব না মেলে ক্ষতি নেই ;

কেননা, এই তিনটি উপন্যাসেরই কাহিনীর বহিরঙ্গ ভিন্ন—সেখানে কাহিনীগুলোরই নিজস্ব ভঙ্গী রূপ ও গতি আছে। কেননা সেটা "শিল্পকাজ"। তাদের সঙ্গে তত্ত্বের যেটুকু বৈষম্য সেটুকু নিতান্তই স্থূল ও নগণ্য। চরিত্রগুলোর মূল মর্মকথা এই তত্ত্বকেই সমর্থন করবে।

এই তিনটি বইয়ের নামকরণও উল্লেখযোগ্য—কেননা, এঁরা সকলেই সচেতন লেখক। চন্দ্রশেখর অর্থ শিব; শিব চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই একটা বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব আছে। প্রতাপ অর্থ পরাক্রম, তেজ, উত্তাপ। শৈবলিনী অর্থ নদী—যা প্রবহমানা, যা বর্ষার ভরা যৌবনে দুরন্ত, বর্ষান্তে যা ক্লান্ত ম্রিয়মানা। (নিখিলেশ অর্থ বিশ্বেশ্বর—নিখিলের উদার ব্যাপ্তির যিনি স্বামী বা অধিকারী। সন্দীপ অর্থ সন্দীপন থেকে করলে হয়, যা জ্বালায়, সন্দীপন অর্থ প্রজ্বলন। কিন্তু আমার ঝোঁক যায় একটা ব ফলা বসিয়ে দিতে এবং ইচ্ছে হয় সন্দীপকে সঙ্কীর্ণ দ্বীপে আবদ্ধ জীবের সঙ্গে তুলনা করি। বিমলা অর্থ যাতে মল নেই। বস্তুত, সন্দীপের আবির্ভাবই তাকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছিল, কালক্রমে তাও থিতিয়ে পড়ে তার বিমল স্বভাব ফিরে এসেছে। গৃহদাহের নামকবণেও ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। মহিম অর্থ মহিমময়, যা মহিমান্বিত। সুরেশ ইন্দ্রের নামান্তর এবং প্রকৃতিতেও তাই—কামাসক্তিই যেখানে প্রবল। অচল অর্থ দোটানায় যা ডেডলক সৃষ্টি করে।

ঘরে বাইরের আলোচনায় এও প্রাসঙ্গিক মনে করি।

বিমলার কথা থেকেই সুরু করা যাক।

"স্বামীকে দেখলুম তার (কল্পিত রাজপুত্রের) সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন কি তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা ঘুচল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল।"......

কেন এই দীর্ঘনিশ্বাস? জীব প্রকৃতির best selection (শ্রেষ্ঠ স্বয়ম্বর) এর পথে কোথাও বাধা ঘটেছে। বিমলা কোন্ ঘরে এবং

কার কাছে এল? বিমলার বয়ানে আছেঃ "আমার শ্বশুর পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা।...কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে (কালটা হ'চ্ছে স্বদেশী কাল—আমার মন্তব্য)। এ বংশে তিনিই প্রথম লেখাপড়া শিখেন, আর এম, এ, পাশ করেন। বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন—তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই..."

বিমলার কালে "ভাবুক পুরুষেরা, সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে-কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে বলছেন।" বিমলা যে-ঘরে এসেছে সেই ভাগের সংসারে "খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন।" এখানে এসে এই ঘরে আবদ্ধ থেকে বিমলা কি প্রকৃত সুখী হয়েছে? এই প্রশ্নই নিখিলেশ করেছে—"আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও।" কেন? না, "তুমি যে কাকে চাও তাও জান না।"

বিমলা সম্বন্ধে নিখিলেশ বলছেঃ "পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ; এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালবাসে।"

নিখিলেশ বুঝতে স্বরু করেছেঃ "ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে-ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে'না।"

এবং—

"আজ একথা স্পষ্ট বুঝেছি বিমলার জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হ'চ্ছে সন্দীপ।"

কিন্তু কেন এমন হ'ল? নিখিলেশ জমিদার, অর্থের অভাব নেই। এম-এ পাশ। শিক্ষিত, ভদ্র, ধীর স্থিরমতি, রুচিসম্পন্ন। বিমলার ভাষায় তার "কোন চঞ্চলতা নেই।" শুধু তাই নয়। বিমলা নিজেই নিখিলেশের উদ্দেশে বলছেঃ তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাইনি

তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখের পাতা পড়েনি তা দেখেছি; আমার দেহকে তুমি এমন ক'রে ভালোবেসেছ যেন স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমন ক'রে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য।"

তবু কেন এমন হ'ল? নিখিলেশের এ ধারণা কেন হ'ল যে, বিমলার সমস্ত প্রকৃতি সন্দীপের সঙ্গে মিলতে পারে?

বিমলাই অনেকবার আপসোস ক'রে বলেছে, তার স্বামী, বড় ভালো, বড় বেশী ভালো, এত ভালো না হলেই ভালো হ'ত। অর্থাৎ সে নিখিলেশকে অতিরিক্ত ভালো হিসেবে তো চায় নি, সে চেয়েছে সন্দীপের মন্দও কিছু থাক নিখিলেশের মধ্যে—তবেই সে নিখিলেশকে পরিপূর্ণরূপে পেতে পারে। নিখিলেশের একথা ঠিক নয় যে, বিমলার সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে মিলতে পারত সে সন্দীপ। এ কথা অর্ধসত্য। বিমলা নিখিলেশকেও চায় যেমন চায় সন্দীপকে; কিন্তু এমন আদর্শ সমন্বয় হয় না বলেই তো এই ঘরে বাইরে ট্রাজেডি—এই অনিবার্য বিপর্যয়।

নিখিলেশ জানে: "সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংস-বহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে।"

বিমলাও জানে: কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে। এখনকার আলোচনা মডার্নকালের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ। "এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয় মূর্তি দিনরাত আমাকে টেনেছে। সন্দীপের মধ্যে যে-জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয়, সেটা চাঞ্চল্য মাত্র তবু আমার রক্তমাংসে এইভাবে গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগলো।"

বিমলার মনের মধ্যে "পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল।' "সে সন্দীপের ফোটোকে হীরে মাণিক মুক্তোর নীচে চাপা দিয়ে চাবি

বন্ধ ক'রে রাখে। সে এ জিনিস কাউকে দেখতে দিতে চায় না, কিন্তু এ তার প্রকৃতির অংশ, তাই অপরিহার্য। সমাজে এ জিনিস নিষিদ্ধ বলেই এতো লুকোচুরি, ভাষার কারচুপি এবং ছদ্মবেশ।

কেন?—সেই এক কথা। নিখিলেশের মধ্যে সংরক্ষণশীলতা আছে, উদ্দামতা নেই, যে উদ্দাম নারী-প্রকৃতির সমান কাম্য। নিখিলেশের মধ্যে এই অভাবই বিমলাকে অনায়াসে সন্দীপের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সন্দীপ বলছে বিমলা একদিন নিজেকে সন্দীপের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে বলল, "ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ।··· রাজা আমাব দেবতা আমার···সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি। যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচিনে, আমি তো আর পারিনে, আমার যে বুক ফেটে গেল। বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পবে ফুলে ফুলে কান্না, কান্না, কান্না। এই তো হিপনটিজম্।"

বিমলা এই সন্দীপকে বাইরের বৈঠকখানায় এবং নিজের অন্তরে আদরের আসন দিয়ে নিখিলেশের সঙ্গে বিরোধ করতে লাগল, সন্দীপকে মুগ্ধ করার জন্য বিশেষ সাজ-সজ্জা করতে লাগল, তার জন্য জমিদারীর টাকা নিজের ঘর থেকে চুরি করল, নিখিলেশের অতিভালমানুষিতে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে সন্দীপের কাছে সে স্পষ্টতই নিজেকে সর্বতোভাবে নিবেদন করল।

নিখিলেশের প্রকৃতি ও সন্দীপের প্রকৃতি 'স্বদেশী' সম্পর্কে উভয়ের মনোভাবেই ধরা পড়ে। নিখিলেশ একদিন বিলাতী বস্ত্র বহ্ন্যুৎসব সম্পর্কে বিমলাকে বলছিল ঃ "গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙ্গে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।"

সন্দীপ তার নিজের চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তবু অনেকসময় নিজেকে সামলাতে পারত না। সে বলে, "যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হ'ল সমস্ত জগতের শিক্ষা।··· লজ্জা? না, আমি লজ্জা করি নে।···আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব, আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা আমার চোখেমুখে দেহে মনে কথায় ভাবে প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়, সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা, চাই-চাই খাই-খাই করতে করতে কোটালের বানের মতো গর্জে চলেছে। বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকে নি।"

বিমলা সম্পর্কে সন্দীপ বলছে ঃ জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি ···আর একটি···স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে।"

বিমলা বলে সন্দীপের "যেমন জোর বক্তৃতায় তেমন ব্যবহারে।"

আর একটি চমৎকার প্রতীক সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ—যেটি আমার থিওরীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। সন্দীপ বিমলার ছবি অপসারণ ক'রে নিখিলেশের পাশাপাশি তার নিজের ছবি রেখে দিল; বিমলা কোনো বাধা দেয় নি; বরং সমাদরে তাকে রক্ষা করেছে। এই তো বিমলার কাম্য, এই দুই বিপরীতের বিন্যাস (জাকসটাপজিসন)। "সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেই জন্যে ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে।"

আরও একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। অমূল্যের সংস্পর্শে এসে বিমলার "নারী হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ একবার খুলে গিয়েছিল। (কিন্তু সন্দীপের পুনরাগমনে)

প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।”

বিমলা মা হয়নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্দীপকে প্রকৃতির উদ্দামতার প্রতীক করেছেন বটে, সম্পূর্ণ শয়তান করেন নি।

“আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল; কিন্তু ওই অস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তর পর্যন্ত কেন পৌঁছল না?”

বিমলা সন্দীপের এই দুর্বলতা ঘৃণা করে এবং তার সেই জবরদস্তি ভাবটি যেখানেই দ্বিধা করেছে, বিমলা ধিক্‌কার দিয়েছে। তাতে বিমলার চরিত্রটি আরো ফুটে উঠেছে; বিমলা সন্দীপের কাছে কি চায় অথবা নিখিলেশের মধ্যে সন্দীপকে কিভাবে চায় তা আরও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সন্দীপের বিবেক ছিল বলেই বিমলার চুরি-করা গিনিগুলো ফেরত দিয়েছে নিখিলেশের কাছে—যেমন ফিরিয়ে দিয়েছে অক্ষত বিমলাকে। এবং বিমলার উদগ্র কামনাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিমলার কাছেই। নিখিলেশ বিমলাকে ছুটি দিয়েছিল যাতে সে সন্দীপের কাছে যায়, কিন্তু বিমলা যেতে পারে নি। সন্দীপ জানত আজ যদি সে বিমলাকে কেড়ে নিয়ে যায়, সে একদিন তার ভেতরে নিখিলেশকে খুঁজবে; আজ বিমলা খেলার পুতুল, কিন্তু সে যদি সেদিন সংসার বাঁধতে বসে? সন্দীপের তাই দুর্নিবার উদ্দাম মুহূর্তেও—দেহবীণার ঝঙ্কার অন্তরা পর্যন্ত পৌঁছায়নি, অস্থায়ীতেই থেমে গেছে। তারপর বিমলার ক্লান্তি এসেছে, সন্দীপের দুর্বলতায় একাধারে বীতশ্রদ্ধ ও উল্লসিত হয়েছে, তারপরই নিখিলেশের তুলনা মনে এসেছে। সেখানে সে আবেগে নিখিলেশকে ডেকেছে —প্রিয়তম। এই কারণেই বিমলার চরিত্রটি এত করুণ এবং পাঠকের মনে একটা সহানুভূতির মোটা দাগ রেখে যায়।

চোখের বালি-গোরা-ঘরে বাইরে উপন্যাসের বাইরে মহৎ উপন্যাসের পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আর কোন উপন্যাস নেই। এদের তুলনায় চার অধ্যায়, শেষের কবিতা প্রভৃতি মহৎও নয়, বিরাটও নয় এবং কাহিনীর বিচারে নৌকাডুবির সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়। এ দুটির একটি রাজনৈতিক শ্লেষ যার প্রথম অধ্যায়টি স্পষ্টত রূপক, বাকী অধ্যায়গুলো ধূম্রাচ্ছন্ন। চার অধ্যায় সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে ওঁর প্রেমিসটা যে নির্ভুল নয় তা তিনি প্রথম সংস্করণের পরবর্তী সংস্করণে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রসঙ্গের ভূমিকা প্রত্যাহারেই অনেকখানি স্বীকার করেছেন।

ভূমিকাটি হুবহু উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন-প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী অপর পক্ষে, বৈদান্তিক, —তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য-প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রধান সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দুমুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালি-জাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথম দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতলার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।"

পারিপার্শ্বিক কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" সুরু

হয়েছে রূপকের খাঁচায়। এলাচের মতো ওপরে নীচে শাসক ও জনসমাজের খোসার চাপে ও আড়ালে জন্ম বা উদ্ভব হয়েছে এলার। এলা কোন মেয়ে নয়, কোন ব্যক্তি নয়, একটি ভাব মাত্র। এজন্য চারটি অধ্যায় ছাড়াও রবীন্দ্রনাথকে এই ভাবোদ্ভূতির ভূমিকা লিখতে হয়েছে। একেবারে প্রথম বাক্যেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

"এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে।"

এলার যে জীবন তা একটি ভাব মাত্র। এ ভাব বিদ্রোহের ভাব। বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। সুতরাং, ভূমিকায় কেবল এলার জন্মবৃত্তান্তই নেই, পর-শাসনের পরিচয়ও আছে। এই পরশাসন হচ্ছে এলার মা। পরশাসনের গর্ভেই এলার জন্ম। গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে নিপীড়িত জনসাধারণের ঔরসে। তিনি এলার পিতা।

মা বা পরশাসন কেমন ?

"মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না।"

বাতিকের কারণ শাসকপক্ষের বিদেশী সত্তার চেতনা। তারা যে বিদেশী ইংরাজ-শাসকেরা একথা এক মুহূর্তও ভোলেনি এবং এই সজাগ চেতনাই তাদের সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে সর্বদা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। সুতরাং ঐ উঁচু-নীচুর, শাসক-শাসিতের বৈরী-চৈতন্য বাতিকে পরিণত হয়েছে। তাদের শাসিতের প্রতি ব্যবহারও তাই "বিচার-বিবেচনার" (সাধারণ আইন-কানুন) "প্রশস্ত পথ" ধরে চলে নি। দক্ষ লেখক রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন চিত্তে সুনির্বাচিত শব্দ ও ভাষায় তৎকালীন সমাজের ভাব গোপন ও প্রকাশ করেছেন।

এমন যে শাসক পক্ষ তারা—

"বেহিসাবী মেজাজের অসংযত ঝাপটায় সংসারকে (শাসিত সমাজকে, এদেশকে, অধিকৃত রাজ্যের পদানত অধিবাসীকে) যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, (আন্দোলনের সৃষ্টি করতেন), শাসন (সত্যিই

শাসন) করতেন অন্যায় করে, (যা ন্যায় সঙ্গত নয় তাঁই করতেন), সন্দেহ করতেন কারণে অকারণে।” (কেননা, বিদেশী শাসকের পক্ষে এই বিচিত্র মানসকূট একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক। অর্ডিনান্সই তাই শাসকের পক্ষে সত্য হয়ে ওঠে)।

“মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ, অবিমিশ্র সত্য কথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়।” শাসনের ক্ষেত্রে সত্য কথার স্থান কতটুকু। গোয়েন্দার ঘরে সাধুর অপমান অনিবার্য। তারা সত্যের মর্যাদা জানে না। তারা তাদের স্বার্থের “সত্যকে” (মানে মিথ্যাকে) সত্য প্রমাণ করতে চায়। এজন্য সত্যকে তারা মিথ্যা বলতই ; কেননা, ও সত্য তাদের কোন কাজে লাগত না। যে সত্য কাজে লাগে না, তা মিথ্যাই। কিন্তু যে মিথ্যা শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে সত্য, শাসিতের পক্ষে তা মিথ্যাই। সুতরাং, শাসক-পক্ষে যেমন থাকে মিথ্যাকে সত্য করার জেদ, শাসিতের পক্ষে তেমনি জাগতে থাকে সত্যকে সত্য বলে জাহির করার জেদ। শাসকের প্রচার-যন্ত্র শাসনের স্বার্থে সাধারণত মিথ্যা প্রচারের যন্ত্র। এই যে ভেদ—

“এ জন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা (সহ্য করা যেখানে অসম্ভব) তার স্বভাবে (প্রকৃতিতেও বটে, নিজ ভাবধারায়ও বটে) প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু শাসকের মনে হয়েছে, এই যে অসন্তোষের ভাব, বিরক্তির ভাব “এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।” করুণাশ্রিত পরাধীন দেশের অধিবাসীর পক্ষে শাসকের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করা অপরাধ—মহা অপরাধ।

শাসনের আবহাওয়ায় এই যে ভাবের শিশু জন্মালো, জন্মাবার পর তার কিছুকাল অগ্রসর হবার পর, অথবা ভাব-পুষ্টির পর এই ভাবের উদয় হল যে—

“দুর্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন।”

জয় ও সঙ্কোচে গণ বা জনসমাজ অথবা শোষিত জনসাধারণ অত্যাচার অন্যায় ও অবিচার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এই ঔদাসীন্য তাদের অত্যাচারীকে আরও দুঃসাহসী আরও স্পর্ধিত করে তোলে এবং অবাধ অত্যাচার চালিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের রূপকের খাঁচায় এই পাখীটিই ধরা পড়েছে। মায়াময়ীর পরিবারে—

"যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী, যারা পরের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুচর্চ্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই ওর মনে অল্প বয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দাম হয়ে উঠেছিল।"

সরকারের যারা চাকর এবং নানা খেতাব-উপাধিতে ভূষিত অথবা অন্যায় অপরাধের দণ্ডে দাগী, তাদের দৃষ্টি তো বেশী দূর যেতে পারে না, ওরা শাসকের দৃষ্টিতে দাগ বুলোয়, কিছুতেই দৃষ্টি উদার করতে পারে না, তারাই তোষামোদে-খোসামোদে এদের বাড়িয়ে তোলে, সরকারের অন্ধ (অদূরদর্শী) প্রভুত্বচর্চায় কোন বাধাই দেয় না। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যে কোন আবহাওয়ায় কারণ-কার্য-সূত্রানুসারে অন্য বিরুদ্ধ কিছুর উদ্ভব হয় ; এবং এই প্রকৃতি দ্বন্দ্ব-গতির নিয়মাধীন। যে অবস্থায়ই থাকে, তার গর্ভে আছে তার অসামঞ্জস্যের বা মৃত্যুর বীজ, তাই অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ মূল অস্তিত্বকে গ্রাস করে এবং দুইয়ের অনস্তিত্বে এক নূতনের উদ্ভব হয়।

এল স্বাধীনতার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা। বিক্ষিপ্ত ব্যষ্টিগত। কিন্তু এল। এল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জাতির জীবনের প্রথম সূচনায় পরাধীন ধর্মবিরুদ্ধ অসহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার দুর্দাম আকাঙ্ক্ষা।

সত্যিকার ইতিহাসে এই অসন্তোষ ধূমায়িত হয় প্রথম অত্যন্ত ব্যষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, চাকুরী-প্রাণ ভদ্রশ্রেণীর বেকারী হতাশায়, কালো-ধলা জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের বৈষম্যে। এখানে জনসাধারণের কথা

নেই ; গণ-বিক্ষোভের সম্ভাবনা নেই ; ব্যষ্টিগত অসহিষ্ণুতার অদম্য পরিণতি ছাড়া আর কোন উপজীব্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" একাধারে এই উপজীব্য ও পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা। এ তাই এলাদের পরিবারের মতোই সংকীর্ণ এবং এলাদের ভদ্র-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিঃসন্দেহে [illegible] কিন্তু কোনক্রমেই নিন্দনীয় নয়। এ শাসকের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র এবং ইতিহাস অনভিজ্ঞের অবিদ্যা মাত্র। ইতিহাসের প্রত্যেকটি স্তর, প্রত্যেকটি মুহূর্তের ঘটনা সত্য, অকারণ নয়, নিষ্ফল নয়। ইতিহাসের প্রতি এই শ্রদ্ধা যার নেই তার ইতিহাস পড়া উচিত নয়, ইতিহাসের কথাও বলা উচিত নয়। ইতিহাস তারা জানে না। "চার অধ্যায়" যে সেই বিচ্ছিন্ন ইতিহাসের এক অধ্যায়ে ঊর্ধ্বস্তর ভদ্রসমাজেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র এ অনুভূতি তাদের হতেও পারে না।

উদাসীন জন-সমাজের আবছায়া-প্রতীক এলার বাবা নরেশ দাশগুপ্ত মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে আত্মভোলা মানুষ। জনসাধারণের মতো "সাংসারিক উন্নতির দিকে লোভ কম," কিছুতেই যেন জীবনের মান বাড়াবার প্রচেষ্টা নেই, "দক্ষতাও সামান্য"। সুতরাং, পরাধীন জাতির বুদ্ধিবৃত্তির অপযশ শাসকগোষ্ঠীর মুখে স্বাভাবিক। প্রাচীন সভ্যতায় গৌরবান্বিত ভারতবর্ষ এই ক্ষেত্রে সাইকলজির পণ্ডিত "বিষয়-বুদ্ধির ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো ক্ষমা পান নি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন।"

ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে বিদেশী-পর্যটকেরা ভারতীয়দের যে অজস্র রকমের প্রশংসা করেছেন তার মধ্যে ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস। লোকে বলে, বিদেশীদের হামলায় এ বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে ভেঙেছে। সুতরাং, তখন একথা খাটত যে, "ভুল করে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করে নিজের ক্ষতি করা বার বারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর (নরেশ বাবুর) শোধন হয়নি।...বিশ্বাসপরায়ণ

ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদা-ব্যথিত স্নেহ…

প্রথম যুগের বিপ্লবীরা এই সদাব্যথিত স্নেহেই অত্যাচারীর প্রতি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। "সবচেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধি-বিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" শাসিত জাতির প্রতি শাসক জাতির এই মনোভাবই তো প্রথম যুগের মেকলে থেকে চার্চিল পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলাদশের বিপ্লবীদের এই তো ইতিহাস যে, "নানা উপলক্ষে মায়ের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে, তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এ-রকম অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারেনি।"

এদেশে একই রাস্তায় একই ফুটপাথ দিয়ে সাদা আদমী আর কালো আদমী যাতায়াত সম্ভব ছিল না। কালো আদমীকে সাদা আদমীর বুটের ঠোক্কর খেতে হ'ত। সাহেবেরা অনায়াসে কুলিদের পিলে ফাটাতো—বৈষম্য, বৈষম্য, আদালত থেকে রাস্তা পর্যন্ত কেবলই বৈষম্য। তবু জনসাধারণ নীরবে সহ্য করে। বিপ্লবীর পক্ষে এ অসহ্য। অপরাধ তো তাদের যারা সহ্য করে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানস পুত্র নরেশবাবুর মুখ দিয়ে এর এই জবাব দিয়েছেন যে, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াই তাই; তাতে বীরত্ব থাকতে পারে, আরাম নেই।"

সাইকলজিষ্ট নরেশ দাশগুপ্তের এই জবাবের মধ্যেই সমগ্র "চার অধ্যায়ের" ভবিষ্যৎ রামায়ণ রয়েছে। তাই তো এ অন্যায়ের প্রতিকার হবে কোন্ পথে? শাসকের স্বভাব আর তপ্ত লোহার স্বভাব, তুলনা মাত্র। আগুনের স্বভাব বদলায় না বটে কিন্তু শাসকের স্বভাব

বদলায়, বদলানো যায়। তা সে তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়েই হোক, তপ্ত লোহায় জল ঢেলে হোক্, অথবা তপ্ত লোহাকে পিটিয়ে নূতন রূপে পরিণত ক'রেই হোক, বদলানো যায়। সে বীরত্বের ভূমিকা নিতে হবে, তাতে আরাম নেই বলে পালালেও তো চলবে না! আর নির্ভয় বীর বিপ্লবীর যে জন্ম হয়, তা তো সমাজের কামনায় এই স্বভাব নিয়েই জন্মায় যে, সে আরাম চায় না, বীরত্বই তার স্বভাব।

এই অবস্থায়ই বিদ্রোহীর জন্ম হয় যেখানে "যারা মায়ের মন জুগিয়ে চলার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি।" "বিচার কর্ত্রীর সামনে" "সত্যি উপস্থিত" করলে কি হবে, "কর্তৃত্বে অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা।"

এই শাসন-ব্যবস্থার আর "একটি উপসর্গ" ছিল, সে হচ্ছে "শুচি বায়ু" বা ভেদবুদ্ধি। ইডেন গার্ডেনে একদিন সাহেব-মেম ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারত না—কুকুর ও ভারতীয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর কামরা নেটিভদের পক্ষে ছিল দুর্গম্য, ডালহৌসী স্কোয়ারে প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারেও আয়োজন ছিল পৃথক।

ইংরেজেরা ট্র্যাডিসানে অন্ধ, তাই তাদের হাত-কড়ি লাগানো মন, হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন বলে এরা নেটিভদের ঘৃণাই করত। এই ট্র্যাডিসান "তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না—এইটেতেই সমাজ মনিবদের কাছে বকশিশ" পায়। একথা পুলিশের পক্ষেও সত্য এবং তাদের "মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের (সমাজ মনিবদের) কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে।"

এই কৃত্রিম ভেদবুদ্ধির নিরর্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে পারে, যারা এ মেনে চলে তাদের কাছে সাহস করে জিজ্ঞাসাও হয়ত করা যায়, কিন্তু তার উত্তর ভৎর্সনা ছাড়া আর কি পাওয়া যাবে?

শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী এই প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পরিত্রাণের

জন্য অপসৃত হ'ল। আপাতত পলায়নে মুক্তি। কিন্তু এই সমাজ-ব্যবস্থার শেকড় ছড়িয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। বিদ্রোহীর মুক্তি নেই। আর 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত, সেই দিন হবে শান্ত, যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ আকাশে বাতাসে' আলোড়ন তুলবে না। জনগণ রইল আত্ম-নিমগ্ন, শাসক রইল তেমনি উদ্যত, কেবল বিদ্রোহীর আনুগত্যের অভাবে দেখা দিল অতিরিক্ত শঙ্কা। "মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বার বার প্রকাশ করেছেন।" কিন্তু মেয়ের ধারণা হয়েছিল (বিয়ের জন্যে) রাষ্ট্রানুগত্যের খাতিরে (মেয়েদের) প্রজাদের প্রস্তুত হ'তে হয় "আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-অন্যায় বোধকে অসাড় করে দিয়ে।"

এলা যখন ম্যাট্রিক্ পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হ'ল। রূপক অপ্রকাশের মাধ্যম মাত্র, এর শৈথিল্যও তাই অত্যন্ত সহজ। এলা বা বিদ্রোহী যখন বিদ্রোহের প্রথম প্রবেশ দ্বার পার হ'ল তখন তাব জীবনে মা, মায়ের শাসন বা রাষ্ট্র-শাসন অসত্য হ'য়ে গেল, অর্থাৎ সে তখন শাসনের বাইরে এল। যে শাসন মানে, তাকেই না শাসন করা চলে ; যে শাসন মানে না ?

উদাসীন জনগণের আকাঙ্ক্ষারূপে এই বিদ্রোহীর জন্ম হয়, সে কালক্রমে তাদেরকেও ছাপিয়ে যায়। তখন সে হয়ে দাঁড়ায় তত্ত্বকথা, কর্মসূচী, কর্ম। আর এখানে এলা পরীক্ষাগুলো পাশ করার পর পিতামাতার নির্ভরতা থেকে স্বতন্ত্র হ'ল। এলার ব্যক্তিত্বের হ'ল জন্ম।

এরই নাম তত্ত্ব বা আদর্শ। আক্রোশ, অভিমান, কিছু নয়। শাসকগোষ্ঠীর অনাচারেও কিছু হয় না, যদি না, এই শাসক-গোষ্ঠীর গোটা পদ্ধতি গ্রাস করার মতো পালটা কোন পদ্ধতি উদ্ভব হ'তে থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের প্রথম নির্বাচনে একথা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে, শাসক-শক্তির অপকীর্তি জনগণের সচেতন শক্তি নয়। বামপন্থী দলগুলি এই ভুলই করেছে। তারা ভেবেছে, শাসক-গোষ্ঠী

এক একটা অনাচার করেছে, আর বামপন্থীর কাজ এগিয়ে গেছে। এই আত্মসন্তুষ্টির ফলে তারা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে কোন গণ-সংগঠন গড়েনি, প্রকৃত বৈপ্লবিক তত্ত্বকথাও তাই প্রকাশ পায়নি, তারা মনে করেছে, শাসক-শক্তির অত্যাচারে শাসিতের মনে যে তিক্তর্তা এসেছে বামপন্থীদের ঐ হবে যথেষ্ট পাথেয়। কিন্তু দিন যতই যাবে ততই বোঝা যাবে ওটা কেবলই নঙর্থক, ওটা সংগঠন ও কোন সুস্পষ্ট পাল্টা আদর্শও নয়। সুতরাং ও কিছুতেই দুর্গত জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষিত হ'তে পারে না। জনসাধারণ প্রথমত বিভ্রান্ত তো হবেই, দ্বিতীয়ত আপদ্‌কালে পরিত্যক্ত হয়েছে বলে মনে করবে। তৃতীয়ত নৈরাশ্যে ও হতাশায় শাসক-শক্তিকেই শক্তি মনে করে প্রণতি জানাবে।

এলা অবশ্য ভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে জন্মালো। এলার দীক্ষা-পরিবেশ ছিল বিদ্রোহেবই মধ্যে, বিপ্লবের নয়। এলার প্রথম দীক্ষাগুরু ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ কে? আমাদের দেশে প্রকাশ্য বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে যা ধারণা তাই। তিনি সুরেন্দ্রনাথও হতে পারেন, সুভাষচন্দ্রও হতে পাবেন। একবার আমার সন্দেহ হয়েছিল ইন্দ্রনাথ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথই; কিন্তু সেটি সন্দেহমাত্র তথ্য নির্ভয় নয়। নামকরণে ও চরিত্র বর্ণনায় সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব চোখে পড়ে।

"দেশেন ছাত্রেরা তাকে মানত রাজচক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত।"

ইন্দ্রনাথ য়্যুরোপে কাটিয়েছেন অনেকদিন, বিশেব খ্যাতি পেয়েছেন। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়্যুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়্যুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল।... (ক্রমে) বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ।...ইন্দ্রনাথ জার্মান, ফরাসি ভাষা শেখবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের

ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

"অপরিচয় সত্ত্বেও অসংকোচে" এলা তাঁর নিকট এল ; কেননা, "আজকালকার দিনে (মানে, সেই টেররিষ্ট যুগে) এরকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্য্যের নয়।" সে "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা" স্বীকার করল। ইন্দ্রনাথই বিদ্রোহী এলার তত্ত্বকথা।

এর পর পটপরিবর্তন হ'ল। কেননা, এটুকু ভূমিকা বা বিদ্রোহীর ভূমিষ্ঠ হবার ইতিহাস মাত্র। ভূমিকা থেকে ঘটনার পাঁচ বছরের ব্যবধান কালের হিসাবে স্বল্পব্যাপ্ত। এইখান থেকেই চার অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় সুরু।

চায়ের দোকানের পাশে, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকান ; স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিশের (অথবা স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত-পুলিশের) পেন্শন্ভোগী—সাবেক সাব-ইন্স্পেক্টর।

এবার তত্ত্বকথা সুরু। যে তত্ত্বকথাই চার অধ্যায়ের মর্মকথা। ইন্দ্রনাথের "বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা ; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।" বে-নামে এলার অননুমোদিত নামে লেখা। কিন্তু এলা বলেছে, "আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হোতে পারে না তা আমি বলব না।···সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচার-শক্তির বাইরে। ভাল লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধ শক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে। আমার বুক ফেটে যায়।"

লেখক যত বড়োই হোন্, তাঁর গণ্ডীতে তিনি সীমাবদ্ধ। তিনি সে গণ্ডী উত্তীর্ণ হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পদ্ধতিকে নিন্দা করেন তখন তাঁর মনে এসব যুক্তির সঞ্চার হয়েছিল। যুবসমাজের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক স্নেহ

রস-যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে নি। এ-যুক্তি ও পুস্তক তাঁর অকৃত্রিমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। স্নেহবশত এই গ্রন্থখানি তিনি প্রত্যাহার করেন নি। ঠিক এই কারণে ইন্দ্রনাথের যুক্তি ও এলার যুক্তিতে কোন বিরোধ নেই, মৌলিক কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেননা এলা নিমিত্ত মাত্র, ইন্দ্রনাথই তত্ত্বকথা, এলা বাঁশী, ইন্দ্রনাথ বংশীধারী। তাই ইন্দ্রনাথ বাঁ হাতে কাঁচা করে লিখলেও তা স্বয়ং ইন্দ্রনাথের ও তাঁর মানস-কন্যা এলার কথা। সেই ইন্দ্রনাথ এলার নামে লিখছেন: "ছেলেরা অকাল বোধনে দেশকে মারতে চলেছে।" এজন্য "বঙ্গ নারীদের কাছে সকরুণ আপীল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে।...দূর থেকে ভৎর্সনা করলে কানে পৌঁছবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা (আর তাই ক'রে ওদের কাজ সাবোটাজ বা পণ্ড করতে হবে)। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হোতে পারে, তা হোক।...মায়ের জাত; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পারো, মরণ সার্থক হবে।"

ইন্দ্রনাথের বাঁ হাতের লেখায় শাসনকর্তাদের সন্দেহ মোটেই হয়নি। সন্দেহ হয়েছিল সেকালের বিপ্লবীদের যাঁরা তখন বন্দী শিবিরে সহস্র সংখ্যায় বন্দী। রবীন্দ্রনাথের লোভ ছিল ছেলেদের ওপর, ওদের বাঁচাবার লোভ। সেই লোভেই, সেই বিশ্বাসেই বইয়ের যুক্তি। কৃত্রিম তো নয়। "কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়, মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া, হয়ে ছোটে যে বাঙাল ছেলেরা তাদেরকে রক্ষার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও একবার এদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অকৃত্রিম বিশ্বাসে এদেরকে অকাল বোধন থেকে সরিয়ে এনেছিলেন এবং ছয় মাসে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতিতে টেনে এনেছিলেন। শাসনকর্তাদের হাতে এজন্য তাঁর দণ্ডও হয়েছিল। তাঁর যুক্তি কৃত্রিম ছিল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই তিনি চেয়েছিলেন ছেলেদের চিন্তাধারার

মোড় ফিরিয়ে দিতে। গান্ধীজীও চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রও এদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—পড়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেন। আজও অনেকে নানা আদর্শের নাম করে এদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সুতরাং শাসনকর্তাদের সন্দেহে কি আসে যায়? বিপ্লবীদের বিশ্বাস ভাঙা বা তাদের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার চেষ্টা অকৃত্রিম বলেই তো তা ভয়ঙ্কর। সেদিন এ সংঘাত ছিল অনিবার্য—এক ভাব আর এক ভাবকে গ্রাস করতে চায়। এদেশের বিপ্লবীদের ভাবের ভিত্তি ছিল অস্থির আবেগ, অচঞ্চল ভাববস্তুতে নিরেট নয়—তাই ধাক্কায় ধাক্কায় তাঁরা পরাজিত হয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ-এলার তর্ক ভূমিকাশেষে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ পাদেই শেষ হ'য়ে যেতে পারত, কিন্তু সে যুক্তি হ'ত একই ব্যক্তির যুক্তি। তারও বাইরে যে যুক্তি তাকেও আহরণ করে খণ্ডন করা চাই, নিজের প্রশ্নেই তা করা চাই এবং তাই নিয়েই চার অধ্যায়ের বাকীটুকু। একথাও ভুললে চলবে না যে, প্রশ্নের প্রকৃতির মধ্যে উত্তরের প্রকৃতি নিহিত থাকে। সুতরাং, বাইরেকার আয়োজন বা পরিচ্ছদ যাই থাক এলা-ইন্দ্রনাথের মূল জিনিস এক।

ইন্দ্রনাথ মেয়েদের "মায়ের জাত" করতে নারাজ, কেন না, তাঁর মতে "কথাটা গৌরবের নয়।" "তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙ্গায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।...তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে।" শরৎচন্দ্রের ওরফে অনিলা দেবীর নারীর মূল্য মনে পড়ে।

নারী শক্তিরূপিণী—সে কি পুরুষকে ভেঙে ফেলায়? উমার প্রতিজ্ঞায় ইন্দ্রনাথের বিশ্বাস নেই। ওকে বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দিতে চান। মিথ্যা প্রতিজ্ঞার নামে "মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।" সে "সুকুমারকে ভালোবাসে" "সেইজন্যেই ওকে

তফাৎ করতে চাই।" সুকুমারের সঙ্গে উমার বিয়ে দিতে তিনি রাজী নন। "ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে।...ওর মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ।" যে অবাঙালী ভোগীলাল (ভোগেই যার আনন্দ) উমার স্বামীরূপে নির্বাচিত হয়েছে "বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে।" ইন্দ্রনাথের মতে "জঞ্জাল ফেলবার সবচেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

একেবারে বৈরাগী দিয়েও কোন কাজ হবে না। "শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে" তিনি "মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন।" কিন্তু "যখন দেখব আমাদের দলের কোন অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে।"

এদিকে এলার খদ্দরেও "রং লেগেছে।" কোন "পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে।" কিন্তু ইন্দ্রনাথ এলাকে জঞ্জালের ঝুড়িতে ফেলতে রাজী নন। "ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।" "এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই—তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।...কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়।...যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।...দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মনে তার উপলব্ধি।...ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ" যারা সইতে পারে না ইন্দ্রনাথ তাদেরই গঙ্গাযাত্রায় পাঠান।

এলার নারীত্ব-রক্ষার আন্তরিকতা অথবা অতীনের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসার পরীক্ষার জন্য "ডাকাত"ও পাঠিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ এলার ঘরে। "শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে।"

ইন্দ্রনাথ এখানে নারীর মূল্য নিরূপণ করেছেন। ইন্দ্রনাথ এখানে

সেকালের স্বদেশীর মূল্য নিরূপণ করেছেন। কিন্তু এ মূল্য কি মর্যাদার ?

মেয়েরা পুরুষদের ভোলায় এইটেই কি বড় কথা, না, মেয়েরা ছেলেদের শক্তি দেয় এইটে বড় কথা ? ছেলেরা মেয়েদের কথায় ভোলে, এইটেই বড় কথা, না, ছেলেরা মেয়েদের উপেক্ষা করতে পারে এইটে বড় কথা ? উমার মতো মেয়েরা উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটায়, উমার ভালোবাসা ভালোবাসা নয়, ও ভোগীলালের ভোগ্যবস্তু মাত্র, বিয়ের আগে তার কান্নাও তাই মেঘডম্বরং। এলার শাড়ীতে রং লেগেছে, এলা অতীনকে ভালোবাসে, কিন্তু সে ভালোবাসা শুষ্ক রুদ্র, তার নিষ্কৃতি চাওয়াটা সত্য নয়। অতীন যদি কখনো সকলকে বিপদে ফেলে তখন সে তাকে নিজের হাতে মারার কথা ভাবতে পারে না। এলার প্রয়োজন ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া, কামিনীর প্রভাব যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকুই।

একথা সত্য যে, এককালে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা শ্মশান-বৈরাগ্য অবলম্বন করতেন, নিজের প্রয়োজনে কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করলেও দলের প্রয়োজনে কাঞ্চনের প্রভাবকে অবজ্ঞা করেন নি। কামিনীর প্রভাবকে তাঁরা বহুদিন এড়িয়ে এসেছেন। তবে যেকালে রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায় লেখেন সেকালে এই সব সন্ত্রাসবাদী আগুনের খেলায় মেয়েরাও নেমেছেন। লেবংয়ের ঘোড় দৌড় মাঠে যে শেষ সন্ত্রাসবাদের চিহ্ন আঁকা হ'য়েছে সেখানেও মেয়েদের অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ বিশ্লেষণও অসত্য নয় যে, পরবর্তীকালে, ১৯১২-২২ এর পর থেকে, বিশেষ ক'রে ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের পর দলে মেয়ের আকর্ষণে ছেলেরা এসেছে। কিন্তু ছেলেদের আকর্ষণে মেয়েরা আসেনি এও তো সত্য নয় ? দলে মেয়েরা এসেছে কোথাও কোথাও মায়ের রূপে, স্নেহে সন্তানের রাজনীতি মায়ের রাজনীতি হয়, সন্তানের ক্রিয়াকলাপে মার যেন অনিবার্য সমর্থন থাকে—সেই মায়ের রূপে। তারপরও যারা এসেছে তারা এসেছে

বৈরাগী পুরুষের আকর্ষণে। সন্দেহ নেই অনেকে ভাবের তাড়নায়ও এসেছে। ভাবের তাড়নাকে ছাপিয়ে রিপুর তাড়না যেখানে প্রবলতর কেবল সেইখানেই তার মৃত্যু হয়েছে। মেয়েদের রক্তচন্দনের ফোঁটা কপালে নিয়ে আত্মোৎসর্গ করেছে এরকম পৌরুষ-প্রকাশের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু এ রক্তাশীর্বাদ গ্রাহ্য করেনি এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সুতরাং, যে কোনো ভাবের প্রেরণায় আত্মবলির জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে তার সঙ্গে মেয়ের আকর্ষণে যে এসেছে তার তুলনা সুবিচার নয়—কিন্তু প্রাণদানের ক্ষেত্রে উভয়ের পরিণতি এক।

এক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথের বিচার-বিভ্রান্তি ঘটেছে সন্দেহ করি; কেন না, এক্ষেত্রে তাঁর কল্পনার আশ্রয় নেওয়া বা যুক্তির কসরত অবলম্বন করা ছাড়া উপায় ছিল না। এসব গুপ্ত জগতের স্বদেশী ছেলেদের সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল সীমাবদ্ধ। সুতরাং, বিশ্লেষণে কোথাও কোথাও যে অমর্যাদার ভাব ফুটে উঠেছে তা ইচ্ছাকৃত নয়, স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এ বিশ্বাসও প্রকট যে, ওপথ পথ নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে যে বিচার-বিভ্রান্তি ঘটে থাকে এখানেও তার বেশী কিছু হয়নি।

এই বিচার-বিভ্রান্তি বা একদেশদর্শিতার জন্য চার অধ্যায়ের মূল সুর রাজনীতি হয়নি, হয়েছে যৌন বা প্রেমতত্ত্বের প্রশ্নোত্তর। স্বদেশী তার অবলম্বন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত স্বদেশী অবলম্বন স্বাবলম্বী, যৌনাচ্ছন্ন নয়।

এলা ও ইন্দ্রনাথের কথোপকথনে বার বার পথের দাবীতে ভারতী ও সব্যসাচীর কথাবার্তা মনে করিয়ে দেয়। প্রশ্নের ধরণ ও উত্তরে বেশ মিল আছে। কেন না, এই দুখানি গ্রন্থই বিতর্কমূলক, ক্রিয়ার বা য়্যাক্‌সানের নয়। নিতান্তই বৈচিত্র্যের জন্য অপর চরিত্রের আনাগোনা হয়েছে যেন। তথাপি পথের দাবীতে গল্পের বা উপন্যাসের বহু ধর্মই আছে, চার অধ্যায়ে তা বিরল, চার অধ্যায় প্রবন্ধ-ধর্মী, সুতরাং, এখানে ইন্দ্রনাথের বক্তব্যই প্রধান। পথের দাবী রাজনীতিপ্রধান, চার অধ্যায় তা নয়।

কানাই গুপ্ত বাস্তবিক পক্ষে একঘেয়ে আলাপের ছেদ মাত্র। ইন্দ্রনাথের বাক্‌সংযমের প্রহরী। ইন্দ্রনাথ এলাকে এও শুনিয়ে দিলেন যে, তিনি দলের লোকের কাছে এলার নিন্দে করে থাকেন (সম্ভবতঃ দলের লোকের ওঁর প্রতি আকর্ষণকে প্রতিহত করার জন্য)। এ অভিযোগ করলেন যে, অতীনকে সে ভাঙিয়ে নিচ্ছে, "সেই ভাঙনে আরও কিছু ভাঙবে।"

বাংলাদেশের নিন্দুক সমাজের ওপর ইন্দ্রনাথের কিছু অভিযোগ আছে। সে অভিযোগ অকারণ নয়। এখানে এলার নিন্দা উপলক্ষে বলছেন ঃ তোমার বারো আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। ...জন্মকাল থেকেই এদের অহেতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।"

অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করেছে একথা সর্বাংশে সত্য নয়, ব্যর্থও হয়েছে। নইলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রদীপ্ত তেজে তো পেতামই না, পেতাম না, রামমোহন রায়কে, দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগরকে, স্বামী বিবেকানন্দকে, সেদিনকার চিত্তরঞ্জন দাশকে। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিন্তু ইন্দ্রনাথ নিন্দুক দলে যাদের সত্যই ফেলতে পারতেন তারা ঐ কড়া টেররিষ্ট স্বদেশীদের ভিড়েই ভিড়েছিল। ইন্দ্রনাথ একথা হয়তো জানতেন না, বাংলাদেশে টেররিষ্ট দলে সব চাইতে বড় দোষ ছিল যৌন-কামনা নয়, যৌন-কামনার সাময়িক বিকৃত প্রকাশও নয়, এ-দলগুলির সব চাইতে বড় পাপ ছিল ভিন্ন দলের অহেতুক নিন্দা, শত্রুতা—ভিন্ন দলের লোককে, লোক-বিশেষকে পুলিশের চর ব'লে প্রচার করা। এসব নিপুণ অপযশ প্রচারের প্রবৃত্তি উৎসারিত হ'ত দল-নেতাদের মাথায়, অপর কারও জনপ্রিয়তা এদের ছিল অসহ্য এবং সেই জনপ্রিয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি মাত্র কৌশলই তারা জানত —সে কৌশল হ'চ্ছে তাকে পুলিশের চর বলে ঘোষণা করা। দলনেতৃবৃন্দের এই যে দুর্মতি বা বৈরিতা তার ব্যাপক সূচনা হয়েছে

অসহযোগ আন্দোলনের পর—যখন দেশবন্ধুর ডাকে সব স্বদেশী দাদারা প্রকাশ্যে ভেসে উঠলেন এবং কংগ্রেসের কয়েকখানা ভাঙা কুটির নিয়ে টানাটানি সুরু করলেন। যাদের অজ্ঞাতবস্থায় মৃত্যুই ছিল কাম্য তাঁরা নাম-প্রচারের জন্য লালায়িত হ'য়ে পড়লেন বলেই অপরের নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হ'য়ে উঠলেন। এ রোগ ইন্দ্রনাথের জানার কথা নয়। কারণ, এ-কাঁটা তাঁর গায়ে লাগেনি। কিন্তু ওতে বহু স্বদেশীর জীবন ধূলিসাৎ হয়েছে।

কিন্তু অপর একটি লক্ষণ অনুমান করেছিলেন, যার সম্ভাব্যতা আছে, কিন্তু স্বদেশীদের ক্রিয়াকলাপের তুলনায় যার সংঘটন সামান্য। সেটি হচ্ছে "জন বৃষভেরই পুষ্যি বাছুর"দের উস্কানি বা প্ররোচনা অথবা প্রয়োজন।* "নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি।" শব্দ সমাবেশের মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এই বৃষভের পুষ্যি বাছুর অভয় পেয়েছে সরকারের কাছে, এরা সরকারের আশ্রিত; এরাই স্বদেশীর নাম করে স্বদেশীদলে ঢুকত এবং ক্রমে দলের "ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে" পড়ত, "মাছির আমদানি শুরু" হ'ত। কিন্তু গোয়েন্দার লোক স্বদেশীদলে ঢুকে স্বদেশীদের প্ররোচনা দিয়ে কিছু ক্রিয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ধরিয়ে দিয়েছে একথা আংশিক সত্য মাত্র। নিজেদের দুর্বলতায় বিপ্লবীরা ধরা পড়েছেন এও অসত্য নয়। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে স্বদেশীরা তাঁদের কাজ করেছেন, প্রাণোৎসর্গ করেছেন এইটে আরও বড় সত্য। সেই সত্যের জোরেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বনিয়াদ ক্রমশ দৃঢ়তর হয়েছে। সেখানে—সেখানে ইন্দ্রনাথের ছিল স্নেহমিশ্রিত বিদ্রূপ। একেবারে 'পথের দাবীর' সব্যসাচীর নিষ্করুণ প্রতিধ্বনি। "এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না," তবু ওকে দলের মধ্যে রাখার কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের

---

* জন বুল হচ্ছে জনবৃষভ, তার পুষ্যি বা অর্থপুষ্ট এজেন্ট প্রভোকেটার। এরা সরকারের সুনজরে রক্ষিত, তাই এদের নির্ভয় বিচরণ।

হিসাব ক'রে সৃষ্টির কাজ চলে না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তন।...ওই যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে,—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।"

এ যেন সেই কামানের খোরাক জোগানো। স্বদেশী ছেলেদের আর কোন তাৎপর্য বা সার্থকতা নেই। ওদের সুন্দরী মেয়েদের টানে আনতে হবে, ডাইনামাইটের মতো বিস্ফোরিত করেত হবে, তাতে কাজ হাসিল হোক কি দল ভাঙুক, "সৃষ্টিকর্তার" কোনো মনোবিকৃতি নেই। স্বদেশী ছেলেরা দলে সুন্দরী মেয়েদের টানে এসেছে একথা স্বদেশীর প্রথম যুগে একেবারেই সত্য নয়, সর্বাংশে মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের শপথ নিতে হ'ত মেয়েদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার। এই শপথ রেখেই তারা প্রাণোৎসর্গ করেছে। বলেছি, পরবর্তীকালে মেয়েরা এসেছে, বিশেষ যেকালে রবীন্দ্রনাথ "চার অধ্যায়" লিখেছেন তার প্রাক্কালে গুপ্ত দলে এসেছে অনেক নয়, কিছু মেয়ে। মেয়েরা বহু সংখ্যায় এসেছে কংগ্রেসে, আরও অনেক পরে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে। কিন্তু মেয়েরা কি দেশাত্মবোধ নিয়ে, লোক কল্যাণের প্রেরণায় দলে ভিড়তে পারে না? মেয়েদের প্রতি এই কটাক্ষ কি সত্য বলে মানতে হবে? আসল ব্যাপার হচ্ছে, ইন্দ্রনাথের কল্পনা ও সংস্কার যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে দল গঠনের ইতিহাস, দলের গুণাগুণ প্রকট হতে পারে না, হয়ও নি।

ইন্দ্রনাথ কানাইয়ের এই অভিযোগ অস্বীকার করেন নি যে, এ নিতান্ত জুয়োখেলা। ইন্দ্রনাথ একটি ব্যক্তি মাত্র, নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার দম্ভ মাত্র, অহংয়ে পরিপূর্ণ এক অসামাজিক অভিব্যক্তি মাত্র এবং এই রসেই ইন্দ্রনাথ রসিয়ে তুলেছিলেন এলা আর অন্তুকে—তাঁর স্বার্থে বলি দেবার জন্য ঃ

"প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি, এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারিদিকের দরজা

বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাকশুনে কতো মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল……কেন। আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পর যা হয় হোক।…ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হোতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।”

এই। এইটেই আসল কথা। একান্ত অসামাজিক ব্যক্তির ভয়ঙ্কর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। এখানে সমাজ নেই, সমাজের ইতিহাস নেই, সমাজের গতি নেই, দ্বন্দ্ব নেই, সমন্বয় নেই, মানুষ সামাজিক জীব কিনা তারও মীমাংসা নেই, সমাজের ক্ষোভ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়ে তা সামাজিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে কিনা, সমাজের ভেতর কোন্ বিশেষ শক্তি সমাজকে অনবরত পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং 'নিতুই নব' রূপ দিচ্ছে, সমাজের মানুষের প্রাণে নানা ভাবের প্রেরণা জাগাচ্ছে, রাজনীতির কাঠামো কোন্ অর্থনীতির ইটে গড়া, সমাজের অর্থনৈতিক বা উৎপাদিকা সম্পর্ক অথবা সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতিটি একে অপরের সঙ্গে কোন্ সুরে বাঁধা, এসব কোনো কথা নেই চার অধ্যায়ে। চার অধ্যায়ে সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বের কথা সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। এখানে অভ্রংলিহ এক ব্যক্তির কথা সোচ্চারে ঘোষিত। ব্যক্তিই কি ইতিহাস? ব্যক্তি ইতিহাস—সে মহাকাব্যের রীতিতে। মহাকাব্য ব্যক্তি-প্রধান কিন্তু এই মহাকাব্যের দিক থেকেও 'চার অধ্যায়' সম্পূর্ণ বা বিরাট নয়। মহৎ নয়। কিন্তু আজও, ব্যক্তির কথা হবে মহাকাব্য? সমষ্টি সমাজ হবে নীরব দর্শক, নতুবা ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদানের উপাচার?

ইন্দ্রনাথ একথার জবাব দিয়েছেন; জবাব দিয়েছেন নৈরাশ্যবাদের অতি দুর্বল জীবন-দর্শনে।

'আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোনাল (যে কথা একেবারেই সত্য নয়)। এই অনিবার্যতাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস

তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধূলোয় মিলিয়ে গেছে—(কেন ?) তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় (ইন্দ্রনাথ তা জানেন না) মস্ত একটা দেনা (কিসের, তাও জানা নেই) জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। (এই সামাজিক ইতিহাসের নির্যাস ?)...বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।' ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে ছাড়িয়ে আনলে এ উক্তি ইন্দ্রনাথের সত্যিই মূল্যবান যে, "আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

নৈরাশ্যবাদের জাহাজে ইন্দ্রনাথ পাল তুলে দিয়েছেন। 'মাঝদরিয়ায়' তাঁর 'জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হ'য়ে' এ তিনি ধরেই নিয়েছেন। ডুবো জাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছেন, যে কজনকে পান ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই ইন্দ্রনাথের জিত। ইন্দ্রনাথের জাহাজের সমাপ্তি এইখানেই। তারপরে ? "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

ইংরেজ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠেই বহু অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র প্রতিকূল বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন 'পথের দাবীতে', রবীন্দ্রনাথ বলছেন চার অধ্যায়েঃ ইংরেজের 'পরে রাগ নয়। 'যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশী। সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না—লজ্জা পায়।...(ইন্দ্রনাথ বলছেন) ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল্ (বোকা ?) ষ্টীম (ধোঁয়া ?) বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।'

এবার যে পরিপ্রেক্ষিতে এই চার অধ্যায় লেখা তা স্মরণ না করলেই নয়। ১৯৩২ সালে বাংলাদেশে চূড়ান্ত সন্ত্রাসবাদের

পর ১৯৩৪ সালে তার ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে। নৈরাশ্য জমে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজ বিদ্বেষ আরও তীব্রতর হয়েছে। কয়েক হাজার বাঙলার জোয়ান বিনা বিচারে বন্দী। কয়েক হাজার তরুণ নানা হিংসাত্মক মামলায় কারারুদ্ধ। কয়েকজনের ফাঁসী মঞ্চে জীবনাহুতি হয়েছে। কয়েকজন সংগ্রামে আত্মবলি দিয়েছে। ইংরেজকে কিছুতেই বরদাস্ত নয়।

তেমন অবস্থায় সন্ত্রাসবাদী কারা? যারা মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না? যাদের ইংরেজ বিদ্বেষে আর সকল বিবেচনা লোপ পায়? ঐ এক বিদ্বেষ মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে? তারা কারা? তারা গ্রাম্য? ইন্দ্রনাথ এই সব গ্রাম্যকে অবজ্ঞা করেন এই কারণে যে, তারা রাগের মাথায় অকর্তব্যই করেছে বেশী। আর যে ইংরেজের 'পরে এত বিদ্বেষ সে ইংরেজের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে। 'ষোলো আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই।

ইন্দ্রনাথ এখানে জাতিবিচার করেছেন। ইংরেজ জাতি বনাম ভারতীয় জাতি। কোন শাসনের 'জাত' নয়, কোন শাসন প্রথা নয়। মানুষ বনাম মানুষ—সাহেব বনাম দেশী। সুতরাং, 'ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়', 'ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানব স্বভাবকে আমি স্বীকার করি।'

হয় জাতি বিদ্বেষ, নয়তো দেশী বিদেশীর বিচার—সমাজ গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের এই কি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি, না সর্বাংশে সত্য? একটা জাতি খারাপ বলেই কি আর একটা জাতি পর্যুদস্ত করে, না ঐ নিপীড়ন বিদেশীর স্বভাব? এতে তো সমাজের গতি প্রকৃতির সবটা জবাব পাওয়া যায় না, মূল তো পাওয়া যায়ই না। জাতের অভ্যন্তরেও কি এই পরবশ্যতার দুঃখ নেই, পরজাতির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও? বিদেশী

পর্য্যদস্ত রাজ্যেই তো কেবল রাষ্ট্রবিপ্লব হয় না—একান্ত আপন গণ্ডীতেও তো এই দাহ দেখা দেয়। তবে সে কোন্ শক্তির প্রেরণায়? সমাজের অভ্যন্তরে সেই দ্বন্দ্বটি কি? সেইটে জানতে পারলে তবেই না নির্লিপ্ত ভাবে একথা বলা চলে যে, ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়? নইলে স্বদেশী বিদেশী অথবা জাতি বনাম জাতির বিচারে এ কেবলই জাতিবৈরী অথবা কোন জাতির পক্ষে সানুকূল ওকালতি হবে মাত্র। সামাজিক ঐ সূত্রটির অভাবেই চার অধ্যায় অহেতুক অসংলগ্ন ওকালতির দোষে দুষ্ট হয়েছে, যেমন হয়েছে আনন্দমঠ: আবার জাতি-দ্বেষে দুষ্ট হয়েছে যেমন 'পথের দাবী'। ইন্দ্রনাথ নিজের আত্মলুপ্তিকে 'আমাদের আত্মবিলোপে' পরিণত করেছেন, এককে ব্যাপ্ত করেছেন মাত্র, ওঁর স্বভাবকে তিনি মানব-স্বভাব বলে প্রচার করেছেন। প্রাণপণ সে স্বভাবকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবেন এই ঘোষণায়ই চার অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে।

বাকী অধ্যায়গুলো গল্পের জের মাত্র।

'আনন্দমঠ' একভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাতে আধুনিক সন্তানদের কতখানি কল্পনা ছিল এবং সেই কল্পনার সঙ্গে আনন্দমঠের কতখানি মৌলিক যোগ ছিল—একথা তর্ক সাপেক্ষ। 'পথের দাবী' আর একভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে, কিন্তু সে প্রেরণা পথের দাবীর য্যাকসন-হীনতার মতই নিষ্ফলা। তাতে পথের দাবী ছিল, পথের নিশানা পাওয়া যায় নি। কিন্তু চার অধ্যায় টেররিষ্ট সাপ্রেসান য়্যাকেটর তপ্ত আবহাওয়ায় প্রতিকার-প্রত্যাশী তরুণ সমাজকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। চার অধ্যায়কে তৎকালীন বঙ্গসমাজ উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করেনি—সদুপদেশ হিসাবেই গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহভাজন সুভাষচন্দ্রকে নেতাজীরূপে দেখে যাননি। দেখলে ইন্দ্রনাথকে আমরা অন্যভাবেও পেতে পারতাম।

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা সম্পর্কেও আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত এজন্য যে, এটি প্রকৃত উপন্যাস নয়, সর্বতোভাবে একটি সুন্দর কবিতা মাত্র, কাহিনী সামান্য, ঔপন্যাসিক মহৎ সম্ভাবনা অনুপস্থিত। এ শব্দ বিন্যাস চাতুর্যের এবং অতি দক্ষ রূপকারের অঙ্কননৈপুণ্যের অপূর্ব দৃষ্টান্ত মাত্র।

সাধারণত রবীন্দ্রনাথ যে-শ্রেণী থেকে তাঁর-নায়ক-নায়িকা বেছে নেন এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। "অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে-পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।" এসব নায়ক-নায়িকা লেখাপড়া, বিদ্যা, কালচারেও শীর্ষস্থানীয়! অমিত রায়ও ব্যারিষ্টার। "ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী 'রয়' ও 'রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রীগেল ঘুচে।...ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট রায়ে।

যে-কাল এই কাহিনীর পটভূমিকা তাই হচ্ছে এই ঃ—"বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর।...তিনি আগাম জন্মেছিলেন।...

"এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এই রকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করিতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছায় পঞ্জিকার একেবারে উল্টোদিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও 'মা' বলে ঠাণ্ডা করতে চান।"...

এমনি একটা বিমিশ্র সমাজ থেকে বেরিয়েছে 'অমিট্ রায়ে', সিসি লিসি, লিলি গাঙ্গুলী, কেটি মিত্তির ইত্যাদি। তাদের চালবোলের বর্ণনা যে-দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে তার বিশদ উদ্ধৃতি অসম্ভব; কেননা, তাহ'লে বইয়ের অনেকখানিই উদ্ধার করতে হয়।

'শেষের কবিতা নিজস্ব গুণে অপূর্ব কাব্য—কিন্তু এর মূল সুর সেকালে এক ধরণের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতিগতি এবং আধুনিক লেখকদের ভাষা ভাব ভঙ্গীর উদ্দেশে উপভোগ্য শ্লেষ। যারা নাম ও উপাধি পাল্টে বসুকে বোস, বোসকে ভোস, বা বাসু, বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জি, ব্যানার্জিয়া, বোনার্জি, সেনকে স্তেইন ইত্যাদি করেছেন—অমিট রায়ে তাদের প্রতিভূ।

তার বোন লিসি ও সিসি। আর তাদের বন্ধু কেটি মিত্তির। অস্বাভাবিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ। যেমন তাদের চলন বলন, তেমনি তাদের ন্যায়নীতিবোধ। এ এক শ্রেণীর কালাপাহাড়ী কাণ্ড।

আধুনিক লেখকেরা অনেক আপষ্টার্টের সৃষ্টি করেছেন। তার মূল কারণ এদের অধিকাংশ এমন পরিবেশে মানুষ যে-পরিবেশ অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু হঠাৎ বড়লোক হবার কামনায় অস্থির। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজ কন্যার কল্পনা। এককালে বাংলা সাহিত্য এমন অশ্রদ্ধেয় হতাশার কাহিনীতে ছেয়ে গেছল, আজও তার জের কাটেনি।

শেষের কবিতা রচনার কালটা ১৯৩০। ঠিক আইন অমান্য আন্দোলনের কালে। সে-সময় দেশব্যাপী এই যে রাজনৈতিক ভূমিকম্প হচ্ছিল তা সেদিনকার কোন লেখককেই যেন স্পর্শ করেনি। তাঁরা পেটিকোটের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সমাজ বা দেশের বৃহত্তর কোন ছবি নেই ১৯৩০এর দশ বছর আগেও নয়, ১৯৩০এর দশ বছর পরেও নয়।

এই আধুনিক লেখকেরা কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টির সীমায় ভাষাকে বহুলাংশে সংস্কৃত শব্দাধিক্য থেকে মুক্ত ক'রে ঝরঝরে ক'রে এনেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মহৎ উপাদানের অসামান্য কার্পণ্য অথবা দারিদ্র্য প্রকাশ

করেছেন। কিন্তু ঐ ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে গুরু-চণ্ডালীপনা ছিল শেষের কবিতায় তারও সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সব মিলিয়ে শেষের কবিতা এক বিস্ময়কর সাবলীল গতি পেয়েছে। ইংরেজি শব্দ যেমন অনর্গল মিশিয়ে দিয়েছেন তেমন দিয়েছেন দেশী গ্রাম্য কথাও। ঠাকঠমকটা, ঘাড়ে গর্দানে, স্টাইল, বেখাপ, ওরিজিন্যাল বেদস্তুর, পাসমার্ক, ওয়েটিং রুম, স্পেশালট্রেনের সেলুন-কামরা; সেলাম, কায়দা, হাম্বাগ, পিলপেগাড়ি ইত্যাদি অবাধে ব্যবহার করেছেন। শ্লেষ আর হাস্যরস কোথাও কোথাও সুন্দর সমন্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বনাম নিবারণ চক্রবর্তী এককালে একদল আধুনিক কবি রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত হওয়ার যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্র-গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এতে তাঁদের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে যদি কেউ একটি ক্ষেত্রে কিছুকাল রবীন্দ্রনাথকে ম্লান ক'রে দিয়ে থাকে তো সে কাজী নজরুল ইসলাম, সে ক্ষেত্রটি স্বদেশী সঙ্গীতের ক্ষেত্র। সেকালে নজরুল-সঙ্গীতের একটা ব্যাপক আবেদন ছিল। কিন্তু কালক্রমে সে ভাঙার গান, বিষের বাঁশী থেমে গেছে, ভাঙার খেলা ও সাপুড়ে নৃত্যতে শেষ হয়েছে। আজ আবার রবীন্দ্র সঙ্গীত চারদিকে। ঐ ক্ষেত্রটি ছাড়া অন্যত্র কবিকুল রবীন্দ্রনাথের ছায়ায়ই বড়। (অমিতর আড়ালে নিবারণ চক্রবর্তীর মধ্যে আসলে রবীন্দ্রনাথেরই অস্তিত্ব বিরাজমান।) সমাজে ও সাহিত্যে নানারকম রুচি বিকৃতি ও মতিবিভ্রান্তি এই কাহিনীর নিজস্ব গতি ও লেখকের বর্ণনায় আভাসিত হ'য়ে উঠেছে, কবিতাগুলো যে অনবদ্য একথা নতুন ক'রে বলা বাহুল্য। কিন্তু আমরা যে পর্যায়ের মহৎ উপন্যাসের কথা ভাবি, শেষের কবিতা এবং তার পূর্ববর্তী চার অধ্যায় সে পর্যায়ভুক্ত নয়। নৌকাডুবি চোখেরবালি গোরা ঘরে বাইরেতে আমরা রবীন্দ্রনাথের মহত্ভাবকে লক্ষ্য ক'রে এসেছি, এখানেও তা অক্ষুণ্ণ। (লাবণ্য-অমিতর অবাধ কোর্টশিপ সত্ত্বেও লাবণ্য একটি অতি সাধারণ সাংসারিক সম্পর্ক পাতাতে রাজী হয়নি।) যার যার স্বাতন্ত্র্য রেখে এ সম্পর্ক কি মহৎ থাকে,

না, কারও স্বাতন্ত্র্যই কারও ঘুচিয়ে দেওয়া উচিত ? "যে-মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। সে যোগমায়াকে বলেছিল ঃ "বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটামানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।" অমিতরও এমনি একটা অভিমত ছিল ঃ "অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেই জন্যে তারপর থেকে মিলনকে করে এত অবহেলা।"

লাবণ্যর শেষের কবিতা ঃ

মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত মূরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাক তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা—
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবেনা মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে

কিন্তু যোগমায়ারও একটা জবাব আছে ঃ

"ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।"

এখানেও সেই এডজাস্টমেণ্ট ও মিস-এলায়েন্সের প্রশ্ন। সেই ঘরে বাইরের বিরোধহীন সহাবস্থানের প্রশ্ন। মনে হচ্ছে এ প্রশ্ন অনাদি। রবীন্দ্র উপন্যাসে এই অনাদি প্রশ্নই তার কয়েকটি উপন্যাসকে মহৎ মর্যাদা দিয়েছে।

বউঠাকুরানীর হাট

বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসটির উল্লেখ করিনি। কেননা, রবীন্দ্র পটভূমিকায় অথবা যে রাবীন্দ্রিক মানদণ্ডের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিশ্লিষ্ট করতে চাইছি সেদিক থেকে বউঠাকুরানীর হাট আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। এমন অনেক বই বাংলাসাহিত্যে ঝরে পড়ে গেছে, ঝরে পড়ে যাবে, এবং ঝরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। বউঠাকুরানীর হাট রবীন্দ্র রচনাবলীতে স্থান পেতে পারে বা না পারে, কিন্তু বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের তালিকায় এর স্থায়ী আসনের দাবি থাকা উচিত নয়। এর প্রথম প্রকাশ ১২৮৯ সালের পৌষে; আজ থেকে ৭৮ বছর আগে। অথবা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর কোন সংস্কার করেন নি, ১৩৩৯ সালেও নয়। ইতিহাসের দিক থেকে, রবীন্দ্রনাথের রাবীন্দ্রিক পরিণতির দিক থেকে তার মূল্য আছে। কেননা, এযুগ বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক যুগ; দামোদর শ্রেণীর অনেকে তাঁর অনুকরণ করেছেন, ভাব-ভাষা, আঙ্গিক উপজীব্য সব কিছু। রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট সে-যুগের ব্যতিক্রম নয়। এর নায়ক যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য, উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমা, বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যেব কাছে অসহায়। প্রতাপাদিত্যেব বাৎসল্যের চাইতে রাজকীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবলতব, পুত্রবধূকে বিষ খেতে হয়, এজন্য রাজপরিবারে কোন অনুশোচনা নেই, প্রতাপাদিত্য পাঠান ঘাতক পাঠিয়ে ছেলেকে বন্দী করেন, বন্দীশালায় রাখেন; পিতৃব্যকে পাঠানের ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। পুত্র যেমন বিদ্রোহ করে না, পিতার বন্দীশালায় আত্মসমর্পণ করে, পিতৃব্যও তেমনি ঘাতককে আঘাত করার জন্য আহ্বান করেন। কোন প্রতিকার নেই। প্রতাপাদিত্যের একমাত্র কন্যা প্রতাপের দম্ভের পোষণে পতিগৃহে যেতে

পারে না, যখন যায় তখন তার পতিগৃহে অনাদর শুধু নয়, পতি দ্বিতীয় পত্নী ঘরে আনছেন। উদয়াদিত্য নিজের বোনকে নিয়ে কাশী গেল। বউঠাকুরানীর হাট প্রতিষ্ঠা করল। কাহিনীর সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য, বিধান কঠিন। আগাগোড়াই গল্পের ছন্দ কেমন দুর্বল। বঙ্কিমচন্দ্রে যেমন অলৌকিকতা বা সন্ন্যাসীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, বউঠাকুরানীর হাটেও তেমনি এক মায়াবিনী ডাইনী আছে। তবে এ ডাইনীর আচরণ মূলত মানবিক প্রবৃত্তিজাত ঈর্ষার তাপে নিয়ন্ত্রিত।

বউঠাকুরানীর হাটের যে-কোন সংলাপে এই কাহিনীর প্রকৃতি ধরা পড়ে।

"বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম। আর একটি কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।"

সকল ঔপন্যাসিক ত্রুটি সত্ত্বেও যে-কৌতূহলের মধ্যে পাঠককে বরাবর আকর্ষণ করে সেটি একটি মহৎ ভাব এবং সে-মহৎ ভাবের প্রতীক বসন্ত রায়। তাঁর জীবন সঙ্গীতময়, সুর ও ছন্দে নন্দিত, সঙ্গীত ও সঙ্গীতের যন্ত্র তাঁর সাথী, তাঁর হৃদয় ভালবাসা ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ, তাঁর হৃদয় কুম্ভে বাৎসল্য রস উপচীয়মান। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—তিনি সর্ব অবস্থায় নির্ভীক, মৃত্যুভয়হীন। এই নির্ভীকতায় অহেতুক কোন আড়ম্বর বা গর্জন নেই, প্রশান্তসাগরের মতো সে নির্ভীকতা নিস্তরঙ্গ ও স্নিগ্ধ। নাতি নাতনীকে লোকে যে-ভাবে আহ্বান করে, তিনি মৃত্যুকেও তেমনি অকুণ্ঠ স্নেহে ডাকেন, এসো এসো। প্রতাপাদিত্য তাঁর পেছনে ঘাতক লাগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এই মহৎ ব্যক্তিটির সংস্পর্শ ঘাতকের নিষ্করুণ হৃদয়েও দ্বিধা ও অনুতাপ আনে। মরতে ইচ্ছে বলে যেমন উত্তেজনা নেই, বেঁচে গেলেন ব'লেও তেমনি উল্লাস নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপাদিত্য যেখানে হিংসায় উন্মত্ত, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র যেখানে নির্বীর্য, সেখানে বসন্ত রায়

মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ দেখে বলেন, "রোসো, ইস্টের নাম নি। তারপর নিজেই ঘাতককে ডাকেন, "সাহেব, এইবার!" এ যেন সেই একই আচরণের পুনরাবৃত্তি—সেই যখন জানা গেল, প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যকে হত্যার আয়োজন করেছেন, জানা গেল, ঘাতকের মুখেই, সে-কথা শুনে ছুটলেন প্রতাপাদিত্যকে আশীর্বাদ করতে।

আগাগোড়া সঙ্গতিপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে রাজকীয় অভিজাত কোন গুণ প্রকাশ পায় নি—প্রতাপাদিত্য অতি সাধারণ চরিত্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য একটি একরোখা ও কুটিল কেরানী যা করতে পারে এ যেন তাই।

সুরমার নম্রতা বা উদয়াদিত্যের বাধ্যতার মধ্যে কোনো বীর্যের পরিচয় নেই, একটা কুৎসিত অবাঞ্ছিত ভীতিই তাদের আচরণকে সর্বাংশে হেয় করেছে। এক বসন্ত রায়ই এই গ্যাস বাষ্পের বদ্ধজলায় আকস্মিক পঙ্কজ। কিন্তু উপন্যাসটি ব্যর্থ—বসন্ত রায় একটি অনবদ্য গল্পেরও শ্রী হ'তে পারত। বসন্ত রায় বউঠাকুরানীর হাটের জিনিস নয়।

চতুরঙ্গ

'চতুরঙ্গ' কেবল আয়তনে নয়, বস্তু হিসেবেও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস নয়। এর প্রকাশকাল বাংলা ১৩২১ বা ইংরেজী ১৯১৫। 'সবুজ পত্রে' বেরোবার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৩২২ সালে। অর্থাৎ আজ থেকে ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আগে, প্রথম ইউরোপীয় বা বিশ্বযুদ্ধের কালে।

আমাদের ভারতীয় সমাজ-জীবনে বিশেষ কোন সংঘাত ঘটেনি এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায়; একদল গুপ্ত আন্দোলনের বিপ্লবী একটা সর্বভারতীয়

অভ্যুত্থানের চেষ্টায় ঠিক এই সময়টায় ধরা পড়ে যান। কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা রাজরোষে পড়েন। নইলে ভারতের পৌনে ষোল আনা সমাজ অচঞ্চল ছিল—যা-কিছু সামান্য কষ্ট ছিল বিলাতী পণ্যের আমদানী ঘাটতিতে আর এদেশের শিল্পদৈন্যে। সেদিক থেকে এ ছিল বোম্বে-আমেদাবাদের জন্মকাল, আর বাংলাদেশের একটি তরুণ রাজনৈতিক সন্ন্যাসীদলের আত্মক্ষয়ী ভাবালুতা। সবুজ পত্রে যুক্তিবাদই ছিল মুখ্য; কিন্তু এই মুষ্টিমেয়ের চিন্তা গুপ্ত আন্দোলনের বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ বা আলোড়িত করেনি। দুটি চিন্তাধারা দুটি পৃথক খাতে বয়ে গেছে। সমগ্রতার দিক থেকে কোনটিই সম্পূর্ণতা লাভ করে নি বা সর্বগ্রাসী হয়নি। সবুজ পত্রের প্রভাব বেশী করে পড়েছে সাহিত্যে—যেমন পরবর্তীকালে পড়েছে কল্লোল-প্রগতির প্রভাব। আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে, এবং সমাজ-জীবনকেও যেন, এড়িয়ে গেছে। সেখানে সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিই হ'য়ে পড়েছিল মুখ্য এবং কল্লোল-প্রগতি যুগে যার নামকরণ হয়েছিল আর্টস ফর আর্ট সেক (কলার জন্য কলা)।

'চতুরঙ্গ' কল্লোল-প্রগতির হাল্কাযুগের নয়, সবুজ পত্রের সিরিয়াস যুগের সৃষ্টি। সবুজ পত্র গল্পের যুগ নয়, প্রবন্ধের যুগ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধ সমষ্টির উৎকর্ষ অনেক বেশী। এবং এই প্রবন্ধগুলো সেকালে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছে এবং কালক্রমেই ক্রমশ বেশী লোককে ভাবাচ্ছে; কেননা, এসব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক মৌলিক প্রশ্নের সহজ বিশ্লেষণ করেছেন যা আগামী ভবিষ্যতেও বহুকালের জন্য লোকের পাথেয় হবে।

চতুরঙ্গের প্রশ্ন কয়টি মানবিক, একান্ত ব্যক্তিগত। লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের উপসংহার বড়ই বিষণ্ণ; কিন্তু চতুরঙ্গ, যোগাযোগ ও বউঠাকুরানীর হাটে এ বিষণ্ণতা যেমন উচ্চারিত এমন কোথাও নয়। নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা ও ঘরে বাইরের বিষণ্ণতার মধ্যেও একটা বলিষ্ঠ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের

মন ম্রিয়মাণ নয়, মনের মৃত্যু ঘটে নি। বউ ঠাকুরানীর হাটে বাহ্যিক অপঘাত মৃত্যুও আছে, মনের মৃত্যুও আছে; বসন্ত রায়কে বাদ দিলে আর সকলের আচরণই অশ্রদ্ধেয়—চরিত্র সৃষ্টির শিল্পকাজ যেমনই হোক। চতুরঙ্গেও দুটি বাহ্যিক মৃত্যু আছে, কিন্তু অন্তরঙ্গের রক্তপাতও সামান্য নয়। যোগাযোগে বাহ্যিক রক্তপাত নেই, কিন্তু অন্তরঙ্গের রক্তপাত প্রচুর।

চতুরঙ্গ সুরু হয়েছে শচীশ আর তার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে। জ্যাঠামশাইকে অবলম্বন করে যে প্রশ্ন জেগেছে তা এই যে, নাস্তিক হ'য়েও মানুষ আদর্শ সৎজীবন যাপন করতে পারে কিনা এবং মানবপ্রেম ভগবদ্ভক্তির চাইতে হীন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে ছত্রিশ কোটি দেবতার ভক্ত হ'য়েও মানুষ অর্থলোলুপ ও অসৎ হতে পারে কিনা। প্রচলিত ধর্মের দণ্ড দিয়ে যারা মানুষকে মাপেন তাদের কাছে নাস্তিক ঘৃণার পাত্র। নাস্তিক যদি আস্তিকের অধর্মগুলোও মানে তবে বলতে হবে তার কোন নোঙরই নেই। আস্তিকের ভানটুকু পর্যন্ত নয়। কিন্তু জগমোহন কেবল সদাচারী নন, সত্যাশ্রয়ী এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের প্রেমিক। মানবের, এক্ষেত্রে সমাজ-বন্দিনী মানবীর, বড় রকমের ত্রুটিও তাঁর ক্ষমায় মহৎ হ'য়ে ওঠে। কোন সন্দেহ নেই, জগমোহনের চিন্তাধারা বহুলাংশে ইউটোপিয়া, সমাজের দ্বন্দ্বপ্রগতির বিচার সেখানে নেই। কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, এই ইউটোপিয়া, সমাজের এই বৈষম্যের একক নিঃসঙ্গ প্রতিবাদ, প্রতিকারহীন অস্বোয়াস্তি এবং অন্ধ আবেগই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ইঙ্গিত বা পুরোধা। জগমোহনও তাই একটি নির্মল মহৎভাব মাত্র এবং সে ভাবের অবলম্বন যে দেহ তার মৃত্যু হয়েছে অন্ধ সেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, তাতে সমাজ টলে নি, অবিচারের প্রতিকার হয়নি। কিন্তু ভাবটি অমর হয়ে আছে।

মজা এই, জগমোহনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শচীশের রূপ ছিল এক এবং সে নিঃসন্দেহে জগমোহনের দর্পণে প্রতিফলিত; জগমোহনের

মৃত্যুর পর তার রূপ হ'ল আর। নাস্তিক জগমোহনের শিষ্যত্ব হারিয়ে একেবার ঘোর আস্তিক লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব। তার যে-বন্ধু ছিল তারই দর্পণ সে-বন্ধুই তাকে আবিষ্কার করল আস্তিকের আখড়ায়। এখানে জগমোহনের সকল তত্ত্ব গেল ঘুলিয়ে এবং গল্পের মোড়ও নিল একটা অপরিচিত, অবজ্ঞাত ও দুর্জ্ঞেয় রাজ্যে। সেখানে মানুষের সাংসারিক প্রবৃত্তির ভালবাসা মাটির স্পর্শ ছেড়ে হচ্ছে ঊর্ধ্বগামী। কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যায় না। শচীশ ক্রমশই ছায়া হ'য়ে পড়েছে এবং ক্রমশ বিলীয়মান শচীশের আচরণে প্রশ্ন রেখে গেছে, মানুষ কি এমন একটি স্তরে উঠেতে পারে যেখানে মানুষের দৈহিক ভালবাসা তাকে কাতর করে না, সে ঈথারের মতো একটা অদৃশ্য প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারে? অন্তঃসত্ত্বা যে-মেয়েটিকে জগমোহন উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন এবং শচীশের বিবাহের প্রস্তাবকে প্রশ্রয় দেন, সে-মেয়েটি কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিতে একান্ত ক্লেদের মধ্যে আগত প্রথম পুরুষকে ভুলতে পারল না এবং অপঘাত মৃত্যুকেই শ্রেয়তর বলে বরণ করল যখন শচীশের মতো উপযুক্ত পবিত্র পুরুষ মানুষের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব সত্য হ'য়ে এসেছে। এতে মেয়েটির জীবনে ধিক্‌কার আছে, শচীশের প্রতি স্বাভাবিক সংস্কারের শ্রদ্ধা আছে ও নিজের অপবিত্রতায় পবিত্র শচাশকে অশুচি করায় কুণ্ঠা আছে। সত্যি কথা। কিন্তু তাকে ভুলতে পারিনি, একথা কি মেয়েটির কেবলই মুখের কথা?

আর দামিনী? দামিনী মেয়েটি—যার স্বামী তাকে লীলানন্দ স্বামীর জিম্মায় রেখে গেল এবং সেও লীলানন্দকে অবলম্বন ক'রে প্রতাপের উদ্দেশে ফষ্টরকে অবলম্বন করে শৈবলিনীর দুঃসাহসিক অভিসারের মতো শচীশের পেছনে ছুটেছে। কিন্তু শচীশ যখন এড়িয়ে পালাচ্ছে তখন দামিনী সহজ মাটির মানুষের মতো সন্ন্যাসীর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালাবার জন্য শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাসকে ভর করল এবং এইখানে যে প্রশ্নটি শ্রীবিলাস তুলল সেটি কিন্তু পরকীয়া বা

ঊর্ধ্বাকাশী ঈথর সদৃশ প্রেম নয়, তাতে আছে আমাদের একান্ত পরিচিত রক্ত মাংস ও দুর্মদ প্রবৃত্তির তাড়নায় মাটির তৃপ্তি।

শ্রীবিলাস দামিনীর আচরণ লক্ষ্য করে ভাবছে ঃ

"নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে বাহির হইতে যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেখানেই তাহারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণ মালা গাঁথে, যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদেরই মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদের বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি—নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ এটুকু জানে যে, তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয়, আবার সুরে তৈরি-বীণার ঝংকার মাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে, কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না—এই জন্য তারা যদি-বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকু মাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায় এবং হয়তো শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু —যাক, এসব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা…"

না ক্ষোভের কথা নয়, একটা মৌলিক সত্যের আভাস। সেই

আভাস সর্বাংশে পরিস্ফুট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পরিণত উপাখ্যান 'ঘরে বাইরে'-তে।

শ্রীবিলাসের চিন্তাধারায় (হয়তো রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায়ও) চতুরঙ্গকালে যা অস্ফুট জিজ্ঞাসা মাত্র ছিল, ঘরে বাইরে-তে তা পূর্ণ রূপ পেয়েছে। দামিনীর লক্ষ্য ছিল "ভাবুকতার রঙিন মায়ায়" অধরা শচীশ, কেননা, শচীশ নিজেই অধরার পেছনে ছুটেছে ; কিন্তু শ্রীবিলাসকে দামিনী ব্যবহারে লাগিয়েছে। হয়তো একটুকু শ্রদ্ধাও ছিল, তাই শ্রীবিলাসের খোলাখুলি প্রস্তাবে দামিনী বলেছিল, "ও কী কথা বলিতেছ, শ্রীবিলাসবাবু।" এ যেন সেই বিহারীর প্রস্তাবে বিনোদিনীর বিস্ময়। কিন্তু বিহারী-বিনোদিনীর বিয়ে হয়নি, শ্রীবিলাস-দামিনীর বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়েতে শান্তি বা স্বস্তি ছিল না। শ্রীবিলাসকে অবলম্বন ক'রে দামিনী শচীশের ঈর্ষা উদ্রেক করেছিল, শচীশ বিব্রত, দ্বিধাগ্রস্ত, কিঞ্চিৎ চঞ্চলও হয়েছে, দামিনী আশা করেছে সন্ন্যাসীর দুর্বলতা ধরা পড়েছে এবং সে দামিনীর কাছে ধরা দিল ব'লে। প্রথমে আড়াল ছিল লীলানন্দ স্বামী, পরে স্বচ্ছ আড়ালের আবরণ হ'ল শ্রীবিলাস। দামিনীর অভিসারের ফল হয়েছে বিরূপ এবং বারংবার (বিহারীর উদ্দেশে বিনোদিনীর উৎক্ষিপ্ত চুম্বনের মতো) প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, অন্ধকার গুহায় শচীশের কাছে উৎসর্গীকৃত দেহের উত্তমাংশে পড়েছে বাঞ্ছিতের পদাঘাত।

শচীশ তখন তার সাধনামার্গের যে বিন্দুতে অবস্থান করছিল সেখানকার সঙ্গে তর্ক বেধেছিল শ্রীবিলাসের। সে বলেছিল, "সাধনা তাহাকে বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়।" কিন্তু শচীশের বক্তব্য : "আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে আমরা বদ্ধ, সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। একথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।"

'সাধারণ মানুষমাত্রেই প্রতিমাপূজক, রূপে আবদ্ধ এবং রূপ পেয়েই মনে করে তার মুক্তির পথ খুলল। সন্দেহ নেই, মানুষের উত্তরোত্তর কামনার শ্রীবৃদ্ধি মানুষকে প্রতিমার রূপে আবদ্ধ থাকতে দেয় না—এই সাধারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা অনির্দেশ যাত্রার ইঙ্গিত আছে, সেটা কারো কারো পক্ষে অপরিহার্য ও চরম হ'য়ে আসে—কিন্তু তখনও তো প্রাপ্তির আনন্দ নেই, সামান্য থেকে অসামান্যে চলেছি এই ভাবের অস্বস্তিকর আনন্দ মাত্র। সেও যেন মায়ার মতো নিষ্ঠুর, স্বস্তি নেই। তথাপি মানুষ সীমায় থাকবে না, উত্তীর্ণ হবে, এই তার প্রেরণা।

দামিনীর মধ্যেও সেই সীমোত্তীর্ণের কাছে পরাজয় স্বীকারের, তারই আস্থাভাজন হওয়ার, তার সঙ্গে সর্বতোভাবে মিলিত হবার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা আছে, এই আকূতিও অসামান্য, যা সমাজ মানে না, নিয়ম মানে না লজ্জা ভয় কারো কাছে পরাস্ত হয় না—শ্রীবিলাসকে ডিঙিয়ে সেই রূপ, সেই মুখখানি সেই অনির্দেশ যাত্রীর দিকে তার লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। বাহ্যিক সহস্র প্রত্যাখ্যানে তাকে নিরস্ত করা যায় না।

কিন্তু এই সীমোত্তীর্ণ পরকীয়ার দোতলায়ই যে-প্রশ্ন শ্রীবিলাস তুলেছিল (বা রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন) তার মীমাংসা বা পূর্ণ দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে ঘরে বাইরেতে। চতুরঙ্গে জগমোহনের গোটা অস্তিত্বটাই কেমন খাপছাড়া, হরিমোহন ও তাই, কেননা, জগমোহনের প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করার জন্যই সপুত্র হরিমোহনের বিপরীত প্রকৃতির অবতারণা। শচীশের-রূপান্তর সূত্র হিসাবে বাদ দিলে লীলানন্দ স্বামীও অবান্তর।

যোগাযোগ

(যোগাযোগের যুগ 'বিচিত্রার' যুগ। কল্লোল-প্রগতির পরের যুগ। সবুজ পত্রের যুগ সেখান থেকে অনেক পেছনে। এ প্রথম ধারাবাহিক-ভাবে বেরোয় বিচিত্রায়। আশ্বিন ১৩৩৪ থেকে চৈত্র ১৩৩৫। প্রথম দুই সংখ্যায় এর নাম ছিল 'তিন পুরুষ,' তৃতীয় সংখ্যা থেকে নতুন নামকরণ হয় যোগাযোগ। এই নামান্তর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটি কৈফিয়ত বিচিত্রায় দিয়েছিলেন। তাতে নামকরণ সম্পর্কেই কথা ছিল; যোগাযোগের কাহিনী সম্পর্কে নয়।)

"সম্পাদক মশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন 'তিন পুরুষ' নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থি বন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল, যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। আমার সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে।"

"কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন-তোরণ-ওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়ালমাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই।

"গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন—নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়।"

('তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল—'যোগাযোগ'।)

(এ কৈফিয়ত তিনি লিখেছেন ১৯২৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর, কিন্তু জাহাজে শ্যামের পথে।)

(বাংলা ১৩৩৬ সালের আষাঢ়ে বা ইংরেজী ১৯৩০ সালের জুন মাস নাগাদ 'যোগাযোগ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।)

১৯৩০ সালের মার্চ মাস থেকে সারা ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেছে। আরব সাগরতীরে চলেছেন সত্যাগ্রহী গান্ধীজী। লবণ আইন অমান্যের জন্য ডাণ্ডি মার্চ। বাংলায় সুদূরকুমিল্লা অভয় আশ্রম থেকে আসছে কাঁথি লবণ সত্যাগ্রহে স্বেচ্ছাসেবকের দল।

কিন্তু এও সামান্য কথা। ওদিকে ডাণ্ডি মার্চের অহিংস আহ্বান; এদিকে চট্টগ্রামে সহিংস বাঙালী বিপ্লবীদের ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। অহিংস আইন অমান্যে মাথা পেতে পুলিশের লাঠি নিতে, আর সহিংস আইন অমান্যে ব্রিটিশ শাসনের পোষ্যবর্গের প্রাণ নিতে বাংলার সহস্র দামাল ছেলে চঞ্চল।

যোগাযোগের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। হ'তেই হবে এমন কোন কথাও নেই। কেন না, উপন্যাসের রস সৃষ্টি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টিং নয়। এর রাজ্য নতুন, নিয়ম পৃথক। কিন্তু নামকরণ যেন-না গল্পের ভ্রমণকে কোথাও বাধা দেয় এই যে কথা রবীন্দ্রনাথ বললেন, একথার সার্থকতা কি? গল্প বা কাহিনীর নামকরণ পদার্থ বিজ্ঞানের মতো সংজ্ঞা না হোক, আদৌ যখন নামকরণ হচ্ছে, তখন তার তাৎপর্যও আছে। মানুষের নামকরণে মানুষটির সংজ্ঞা থাকে না কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে। গ্রামের নামকরণের সংজ্ঞা বা উদ্দেশ্য না থাক ইতিহাস থাকে। (গল্প উপন্যাসের নামকরণে সংজ্ঞা বা উদ্দেশ্য না থাক একটা তাৎপর্য থাকেই এবং তা নিরর্থক নয়। ঐ তার পরিচয়।) ঐ পরিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে গল্প ভ্রমণ করে না, করার দরকারও নেই, কিন্তু নামহীন গল্প বা উপন্যাস যখন প্রচলিত নয় তখন গল্পভ্রমণের পর এর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট না করলেও কিছু একটা পরিচয়ের নামকরণ চাই। সেটি যখনই করতে যাওয়া যাবে তখন তা অর্থহীনও হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। বিষবৃক্ষ নামটাতে আমি আপত্তি করি। কৃষ্ণকান্তের উইল নামে দোষ নেই। কেন না ও নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।"

একথা তর্ক-সাপেক্ষ। যোগাযোগের 'বস্তু' আলোচনায় এ তর্ক আমাদের বিষয়ান্তরে নিয়ে যেতে পারে, তাই অবান্তর মনে করি।

(যোগাযোগ কাহিনীর সূত্র বাংলা সাহিত্যের পাঠক অথবা বাঙালী সমাজের কাছে খুবই পরিচিত। বাংলাদেশের আধুনিক জীবনের—কি হিন্দু কি মুসলমান সমাজের—সূত্রপাত লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট থেকে। এর বাংলা নাম জমিদারী প্রথা।) এই জমিদার শ্রেণীকে অবলম্বন করে বাংলাদেশে এক ধরনের গ্রাম্য অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। সেই অর্থনীতির খাঁচায় যারা ধরছিল না তারা সেখানকার ধাক্কায় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবৃত্তি ও পেশার আকর্ষণে নতুন এক অর্থনীতির সূচনা করল। কেননা এ ছিল অনিবার্য। ইংরেজ শাসকেরা এসেছে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূরূপে নয়, বুর্জোয়া প্রতিভূ-রূপে; জোড়াতালি কিছুদিন চলতে পারে কিন্তু (বুর্জোয়ার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে সামন্ততন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ জমিদারী দীর্ঘায়ু হ'তে পারে না। সেই ক্ষুধা জমিদার—জমিদারীর শেকড়শুদ্ধ টান মারল তার মুখের দিকে। কালক্রমে, আমি বলব, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, জমিদারী প্রথা ও গ্রাম্য অর্থনীতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হ'য়ে এল এবং শেষ পর্যন্ত তা এক অনাচার-সর্বস্ব কুসংস্কারের মতো টিকে থাকল।) কিন্তু এই দুর্মদ গতির মধ্যেই সমগ্র বাঙালী সমাজকে এই প্রথা এমন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়েছিল যে, শীর্ষারোহী জমিদার শ্রেণীর এক বিষম আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ভাঙা নাটমন্দিরের আশেপাশে এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে। পক্ষান্তরে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, বৃত্তি ও অর্থনীতি সামাজিক অনাচারের মধ্যে সুরু হ'ল, কালের বিচারে তাও অতি দ্রুত থিতিয়ে গেলে একটা সহজ নতুন রূপ হ'ল বাংলাদেশের (উল্লেখযোগ্য যে, জমিদার শ্রেণী প্রধানত হিন্দু ব'লে এ যখন দুর্নিবার বুর্জোয়া-আকর্ষণের মুখে পড়ল তখন এর পরিপোষক প্রধানত হিন্দু সমাজই পাশ্চাত্যের বিষ ও অমৃত পান করেছিল এবং তখন থেকেই স্বল্পসংখ্যক কিন্তু তড়িৎ গতিতে ক্রমবর্ধমান মুসলমান সমাজের মধ্যে ও নতুন আলোক-প্রাপ্তদের মধ্যে

এক. দুস্তর ব্যবধান—হ্যাঁ, মানসিক ব্যবধান—রচনা করতে লাগল)। স্বভাবতই,(বাংলার আধুনিক সাহিত্যে, বঙ্কিমোত্তর যুগে এই পড়ন্ত ও পতিত জমিদারীর সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে।) অবশ্য বঙ্কিমের আমল থেকেই দেবদেবী, রাজাবাদশার বদলে সাহিত্যে এই জমিদার শ্রেণী নায়কের ভূমিকায় বার বার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সে-স্বীকৃতির মধ্যে এর মুমূর্ষু অথবা অন্তিম-অন্ত্যেষ্টির বেদনাই বেশী প্রস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন ; তিনি জমিদারীর মধ্যাহ্ন সূর্য না দেখলেও তার উত্তাপ অনুভব করেছিলেন এবং পশ্চিমগামী সূর্যের তেজ প্রদীপ্ত অবস্থায় দেখেছেন। কিন্তু এর অস্তকালও আসন্ন দেখে গেছেন।

(যোগাযোগের বিপ্রদাস* সেই জমিদারীর আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ নিয়ে জেগে আছে এবং সে মর্যাদার সঙ্গে নবাগত বণিক সভ্যতার নতুন মূল্যবোধকে এড়িয়ে বাঁচতে চায়। মধুসূদন সেই প্রাচীন সভ্যতার বিরোধ। এই বিরোধ বংশানুক্রমিক বা থিসিসের মধ্যেই ছিল এই. য়্যান্টিথিসিস।) দুই জমিদারের প্রাধান্য নিয়ে লড়াই দুই-পক্ষকেই কাবু ক'রে ফেলেছিল ঃ 'খুন জখম থেকে মামলা উঠল। সে মামলা থামল ঘোষালদের সবনাশের কিনারায় এসে।......চাটুজ্যেদেরও বাস্তুলক্ষ্মী ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল।'

এ কাহিনীর মধুসূদন হ'ল ঘোষালদের এবং বিপ্রদাস হ'ল চাটুজ্যেদের উত্তরপুরুষ।

ঘোষাল পরিবার ভিটেছাড়া হয়ে (রজবপুরে) নতুন ভিটে বাঁধল, এবং এদের দুর্গতি ঘুচল মধুসূদনের ভাগ্য-জোয়ারে। (নুরনগরে) বিপ্রদাস ছিল পুরোনো জমিদারী আগলে। এই সময়ে এবং এদের উপলক্ষ্য করেই "ঘোষাল ও চাটুজ্যেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর একবার বেধে গেল।"

---

* বিপ্রদাস পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রেরও জমিদার নায়করূপে আবির্ভূত হয়েছে, এখানেও সেই আভিজাত্য, সেই মুমূর্ষু বেদনা। কিন্তু সে বিষয়ান্তর।

"বড়োবাজারের তনসুকদাস হালওআইদের কাছে (বিপ্রদাসের) একটা মোটা অঙ্কের দেনা। "একটা কড়া তাগিদে চাটুজ্যেদের সমস্ত খুচরো দেনা এক ঠাঁই করে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেন্ট সুদে" এল মধুসূদন ঘোষালের কব্জায়।

(বংশের পুরোনো অপমানের প্রতিশোধ তুলতে অধুনা রাজা খেতাপধারী মধুসূদন ঘোষাল অধমর্ণ বিপ্রদাস চাটুজ্যের বোন কুমুদিনীর পাণিপীড়নের সঙ্কল্প নিল।) "ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে" বিপ্রদাসের মনে যখন "কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলই প্রশ্ন আসে" আর রাজা মধুসূদনের তাগিদে নীলমণি ঘটক আনাগোনা করতে থাকে তখন কুমুদিনীই এক সময় বিপ্রদাসকে অবাক ক'রে দিয়ে বলল "যাঁর কথা বলছ তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হ'য়েই গেছে।" বোনকে নিরস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বিপ্রদাসের মনে হ'ল, "কী একটা দৈব-সংকেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে।"

এ কি ইলিউসান?

ঘটক বলল, "এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।···ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচল।" এর আগে "কিছু দিন থেকে বার বার তার বাঁ চোখ নাচছে।" "কিন্তু আচার্যি কতবার তার হাত দেখে বলেছে, রাজরানী হবে সে।"

এতদিন পরে কুমুর মন্দভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এল রাজপুত্র ছদ্মবেশে।···তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখলে আজ মনোরথ-দ্বিতীয়া।" ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের ফলার করালে। শিব শিব বলে এবার যখন ঘটক এল তখন "অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ করে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হ'ল না।"

(তারপর সেই-দৈব সংকেতের অনুমান এল বিপ্রদাসের মনে। এবং "এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ।" কিন্তু কুমুদিনী দশ বছর বয়স থেকে বিপ্রদাসের হাতে মানুষ। বাহ্যিক সব শিক্ষা তার, বাহ্যিক আচরণও, পরবর্তীকালে রাজা মধুসূদন যাকে তিরস্কারের

আখ্যা দিয়েছে 'মুরনগরী চাল'। যেসব শিক্ষার মধ্যে কখন যে মীরার মনের প্রকৃতিটুকু কুমুদিনীর মনকে অধিকার ক'রে কল্পলোক-বিহারী ক'রে ফেলেছে বিপ্রদাস জানতে পারে নি এবং কুমুদিনী চরিত্রের ঐটিই বৈশিষ্ট্য, ঐ কল্পনা।)

(ঘরে বাইরে বিমলার কল্পনার রাজপুত্রের সঙ্গে নিখিলেশের রূপ মেলেনি (এবং প্রকৃতিও নয়)। কুমুদিনীর কল্পনা যেন বিয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী আকাশচারী হ'য়ে উঠল এবং বারে বারে বাস্তবের সঙ্গে সংঘাত লেগে কুমুদিনীর জীবন বিয়োগান্তক হ'য়ে গেল।)

(উনিশ বছর অবধি কুমুদিনী যে কটি সুকুমার বৃত্তি নিয়ে বড় হয়েছে তার মধ্যে সঙ্গীত একটি: এবং সে সঙ্গীতের আশ্রয় কেবল এস্রাজই নয়, মীরার ভজনও বটে। মীরার নিজের জীবন এই কারণে সার্থক যে জাগতিক আঘাত পেয়েও তিনি কল্পনার স্বামী থেকে চ্যুত হন নি; কিন্তু আমাদের কুমুদিনী আরও মাটির মানুষ, সে তার মা, বাবার জীবন দেখেছে (দশ বছরের মেয়ে কি ক'রেই বা এত কথা মনে রাখল), তাই জাগতিক জীবনের চেতনা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারে নি, কল্পিত স্বামীর সঙ্গে মধুসূদনের মিল না হলেও সে মীরা হ'য়ে উঠতে পারে নি। কুমুদিনীর জীবনে এইটেই সব চাইতে বড় দুঃখ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাস্তবের কাছে সে অভিমানে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন তার মন যে-কল্পলোকেই বিহার ক'রে থাকুক, তাকে এই আত্মসমর্পণের চরম মূল্য দিতে হ'য়েছে। মধুসূদনের একান্ত যান্ত্রিক দেহ-লালসা অপরিহার্য গর্ভ-ধারণের মধ্যে কুমুদিনীর মানসিকতাকে বিষিয়ে দিয়ে গেছে। সেই প্রথম দিকের ভূপালী সুরের গান, "আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া, রোমে রোমে হরখীলা" মিথ্যা হয়ে গেছে।)

মধুসূদনের বাড়ীর মুখপাতটা হাল ফ্যাসানের এবং অন্দরটা সংস্কারের শ্যাওলায় বিবর্ণ ও জীর্ণ। "এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত।" বিপ্রদাসের পুরোনো জমিদারী ঘরে বিলাত

প্রবাসী কনিষ্ঠের কল্যাণে অথবা কালের প্রভাবে হালফ্যাসানের আসবাবও স্থান পেয়েছে। "বিপ্রদাসের মনের গতি হালের, তবু জাত-কুলের হীনতায় তাকে কাবু করে।" (মধুসূদনের বাইরেটা হাল আমলের, ভেতরটা প্রাচীন সংস্কারে আচ্ছন্ন। সে স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু সে নিজের রীতিতে, নারীর যথাযথ মূল্য দিয়ে নয়, তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে নয়, ভোগ্যপণ্য ও দাসীরূপে।

কুমুদিনীর ঐখানেই অভিমান। দাদার শিক্ষাকে খোঁটা দিলে সে আহত হয়, মায়ের অলঙ্কারকে এবং দাদার দেওয়া আংটিকেই সে মহামূল্য মনে করে—মধুসূদনের অর্থগৃধ্নু মানসিকতার উপহার হীরের আংটি সেখানে তুচ্ছ। কিন্তু শোচনীয় পরিণতি এই যে, মধুসূদন যেখানে **marriage, a legalised prostitution** (কথাটা মূলত ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের, বার্ণার্ড শর নয়) এই তত্ত্বকে সত্য করতে চাইছে সেখানে কুমুদিনীর প্রতিরোধ স্থায়ী হ'তে পারে নি, একটা বিষম দ্বন্দ্ব তাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। অথচ এ শুধু প্রবৃত্তি প্রকৃতি ও সংযমের দ্বন্দ্ব নয়; তাহ'লেও বোঝা যেত; কেননা, কুমুদিনীর মনে বা আচরণে প্রবৃত্তি একেবারেই সক্রিয় নয় (যা বিমলার মধ্যে পাওয়া যায়), এ দ্বন্দ্ব রুচির। কুমুদিনী কল্পলোকে যে রাজপুত্রের গলায় মালা দিয়েছে সে সুরুচির সম্ভ্রমে শ্রদ্ধেয়, মধুসূদনের কৃত্রিম রৌপ্যরূপের এবং স্থূল আচরণের সঙ্গে তার মিল নেই।)

স্থূল জগতের রাজা মধুসূদন এল চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্যের অহঙ্কার নিয়ে, ঘোষাল দিঘির চারি ধারের বন-জঙ্গল সাফ করে—মধুপুরী বসল পূর্ব-পুরুষের ভিটেয় (আজ যা হাত ছাড়া)।

কুমুদিনীর মনে এই লাগল প্রথম খটকা। কিন্তু বিয়ে ভেঙে দিতেও সে রাজী নয়—"ছি ছি, সে কি হয়"? আশা—দেবতা সব ঠিক ক'রে দেবেন। "মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন তিনি আমার পরম গতি।" কুমুদিনী আরও

ভাবল ঃ "সতীধর্ম নির্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজীতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন।" কিন্তু এই ভাবনা কি তার খুব গভীর ছিল ?

আঘাতে আঘাতে এই বিশ্বাসের তীর তার ক্ষয়ে গেছে, ভেঙে পড়েছে। বারে বারে সে প্রতিজ্ঞা করে, মন্ত্র জপে, ধৈর্য রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সব ভেঙে যায়।

(বিয়ের অনুষ্ঠানেও ভদ্রতা ও সৌজন্যের রকমভেদ ও বিরোধ ঘটেছে এবং তা কুমুদিনীকে আরও সংশয়িত করে তুলেছে ঃ "ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন ?") কি ভুল ? যেদিন সে বিপ্রদাসকে বলেছিল "তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে" সেইদিন সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকী থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁর ইচ্ছা। সব শেষের ফুলটি হ'ল নীল অপরাজিতা।"

এ কি ইলিউসান ? মোহ ? এবং এখন থেকে সেই মোহমুক্তির সূচনা ? ট্রাজেডি সেইখানে যেখানে মোহের মুক্তি ঘটতে পারে, কিন্তু বাস্তবজীবনের কঠোর বন্ধন থেকে মুক্তি নেই এবং কুমুদিনীর জীবনে তা হয়ও নি। আর পাঁচটি কন্যা পতিগৃহে যাবার সময় যে একটি অস্থায়ী বিষণ্ণ সুর ধ্বনিত করে, এতো তা নয়, এ যে একটা ট্রাডিসন, একটা মজ্জাগত ঐতিহ্যের চেতনাকে পীড়ন করা, ছিঁড়ে ফেলা। কুমুদিনী ঠাকুরের কাছে মাথা কুটছে আর বলছে ঃ "আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস করে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছি।' কিন্তু সত্যিই সে নতুনকে, পরিবর্তনকে স্বীকার করতে পারে নি। ঠাকুরের উদ্দেশে এ তার অসত্য উক্তি। (বাস্তব স্বামীর সঙ্গে প্রথম বিরোধ দেখা দিল তো ঐ নিয়েই, দাদার দেওয়া নীলার আংটি নিয়ে। পক্ষান্তরে মধুসূদনের সংস্কার এই নিয়ে একবার তলিয়ে যাচ্ছিল। কুমুদিনীর সংস্কার—এই নিয়েই সংসারে ভেসে থাকবে। কিন্তু সেই আংটি খুলে রাখতে হ'ল রাজা মধুসূদনের দাপটে। রাজার এই দাপট কুমুদিনীকে বিদ্রোহী করে তুলতে লাগল—

এবং এই বিদ্রোহের আগুনে একের পর আর ইন্ধন পড়তে লাগল। কুমুদিনী নিজেই সে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পরাস্ত হয়।

"কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচল সেদিন সে তার ভক্তি নিয়ে, আত্মাৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও কোনো বাধা বা খর্বতা ঘটতে পারে একথা তার কল্পনাতেই আসে নি। দময়ন্তী কী করে আগে থাকতে জেনেছিলেন যে, বিদর্ভরাজ নলকেই বরণ করে নিতে হবে! তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চিত বার্তা এসে পৌঁচেছিল—তেমনি নিশ্চিত বার্তা কি কুমু পায় নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বাইরে তাকে দেখলে কই? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যকার রাজা কোথায়?"

সে "চোখ বুজে খুব জোর করে নিজেকে" বলে, 'স্বামীর বয়স বেশি বলে তাকে ভালবাসি নে একথা কখনোই সত্য নয়—লজ্জা, লজ্জা! এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা।'

(কুমুদিনীর মন রুচির এমনই একটি উঁচু গ্রামে বাঁধা। এই তার দুঃখ, প্রবৃত্তি তৃপ্তির আয়োজন কেমন, এইটে বড় কথা তো নয়। এ চিন্তা তার মনে উদয় মাত্রই সে ছি ছি ক'রে উঠেছে।) আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, ঠাকুরের উদ্দেশে নিবেদন জানিয়েছে এবং "মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে।" "মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি'— দাদার কাছে শেখা মীরাবাই-এর এই গানটা বার বার মনে মনে আওড়াতে লাগল।...মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে পরিচয় সে পেয়েছে তাকে কিছুই নয় বলে, জলের উপরকার বুদ্‌বুদ বলে উড়িয়ে দিতে চায়...

একি সহজ কথা?

মোতির মা (মধুসূদনের ছোট ভাই নবীনের বৌ) কুমুদিনীর এই ধ্যানমূর্তি দেখেছিল। সে মনে মনে বলেছিলঃ "আমাদের যখন

বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটো ছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ্ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি।...কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতো বিড়ম্বনা।"

"একরকম জাতি ভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের—যে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়।" এতখানি উপলব্ধি ক'রেও মোতির মা কিন্তু কুমুদিনীর পরবর্তী কঠোর অসহযোগী মূর্তি সহ্য করতে পারে নি।

ফুলশয্যারাতে কুমুদিনী মূর্ছা গেছে।

শ্যামাসুন্দরীর মুখে একথা শুনে মধুসূদনের মনটা দপ ক'রে জ্বলে উঠল; বললে, "কেন তাঁর হয়েছে কী।" সুস্থ হ'য়ে কুমুদিনী মধুসূদনের ঘরে এলে মধুসূদন বলল, "ওই নুরনগরি চাল ছাড়তে হবে।" এটি মধুসূদনের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক ক্ষোভের কথা, কুমুদিনীর পক্ষেও তেমনি সহজেই আহত হওয়ার কথা। কুমুদিনী নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করল। তার এই মৌনতায় মধুসূদনের ক্ষোভ বাড়ল এবং ক্রোধের বশবর্তী হলে সে কতটা নেমে যেতে পারে তার পরিচয় দিয়ে বলল, "তুমি তোমার দাদার চেলা...আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারি।"

এই হ'ল আসল জাতিভেদ—এ জাত কিছুতে ভাঙা যায় না।

তার দাদার আশীর্বাদী (নীলার) আংটি চুরি গেল। চোর স্বয়ং মধুসূদন। চুরি নয়, ডাকাতি। জবরদস্তিই মধুসূদনের জাতি-বৈশিষ্ট্য। মোতির মা ক্ষুব্ধ কুমুদিনীকে বলল, "জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে?" কুমুদিনী বলেছিল, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?"

কুমুদিনীর শিক্ষার বয়ানের সঙ্গে এ বাস্তব সত্যের মিল নেই।

গৃহিণীসচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। তবু সে বলল, "আমি সেই গোলামিই করব।" মোতির মাকে বলল, "নিজেকে দেব বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।")

কিন্তু জাতি স্বাতন্ত্র্য যাবে কোথায়, সে যে তার রক্তে? গোলামি করব বলেই যেমন কুমুদিনীর পক্ষে গোলামি করা যায় না, ভদ্র হব বললেই তেমনি মধুসূদনের ভদ্র হওয়া সম্ভব নয়। মধুসূদন সব জিনিসই বিচার করে মণিমুক্তোহীরের আলোয়, অর্থোপার্জনের কষ্ট ও অর্থের কদর সে জানে। বিপ্রদাস ঋণগ্রস্ত হলেও তার, সুতরাং, কুমুদিনীর অর্থাগম হয়েছে সহজ পথে, তাদের কাছে অর্থটা আলো জল হাওয়ার মতই গৌণ, প্রতি মুহূর্তে মনে ক'রে রাখবার জিনিস ছিল না, তাই তাদের মনোবৃত্তি বিকাশ পেয়েছে ভিন্ন প্রকৃতির আওতায়। মধুসূদন কুমুদিনীকে অর্থের লোভ দেখিয়ে বশ করতে চায়, তার স্থির ধারণা, কুমুদিনী তাকে বড়ো জেনে আসেনি, এসেছে টাকার লোভে। মধুসূদনের এ ধারণাটা যে একেবারেই সত্য নয়, একথা বুঝবে কি ক'রে মধুসূদন? তার রক্তে সে বোধশক্তিই যে নেই। এরা যে দুই পৃথক জাত। মধুসূদন বলে, "এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।" তাই সে অনায়াসে নীলার আংটি অপহরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে মধুসূদনের পক্ষে বলার কথা এই যে, যদি তাব সংস্কার থাকে যে নীলার আংটি সর্বনেশে তবে সে তা অপসারণ করতে পারে; সেখানে কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বলার অবকাশ ছিল। কিন্তু জবরদস্তিতে যে অভ্যস্ত সে বুঝিয়ে বলার পথ বাছবে কি করে?

কুমুদিনীর অসহযোগিতা সুরু হ'ল। সেজ বাতির ঘরে সে দাসীপনা সুরু করল। মধুসূদন বলল, "দেখি কতদিন থাকতে পারে।" মধুসূদনের মনে একথা হতেই পারে। তার বিচারের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু মধুসূদন অর্থোপার্জনে অসাধারণ

হলেও সাধারণ মানুষ। বয়স পার হ'য়ে যাবার পর একটু বেশী বয়সে একবার যখন বিয়ে করলই, তখন আর ধৈর্যের বাঁধ রক্ষা করা দায় হয়ে উঠল। অর্থোপার্জনে যে রুক্ষতা ও বেপরোয়া ভাব, এখানেও তাই; একটি নারীদেহকে বিবাহসূত্রে যখন আনা গেছে তখন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সকল কিছু এর কাছ থেকে পুরো আদায় ক'রে নিতে হবে। সে আশ্চর্য হ'য়ে গেল, এ মেয়ে স্বর্ণালঙ্কার বা হীরের আংটিতে বশীভূত নয়। না হোক, উপেক্ষাও সে সইতে পারে না —বাইরে রাজা বাহাদুরকে কেউ উপেক্ষা করতে সাহস পায় না, ভেতরের লোকে ভয় পায়। কুমুদিনী তার ব্যতিক্রম হবে?

তারপর বিপ্রদাসের চিঠি-টেলিগ্রাম নিয়ে মধুসূদনের কারচুপি। এও তার প্রকৃতিগত এবং এ সহ্য না করাও কুমুদিনীর প্রকৃতিগত। মধুসূদন চায় এই ভাবেই বন্য বাঘিনীকে আয়ত্তে আনবে, কুমুদিনী আশা ক'রে থাকে মধুসূদনের ইতরপনা একদিন ঘুচবে, কুমুদিনী তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে একবার যদি বা সে আত্ম-সমর্পণের জন্য এগোয়, আবার আহত হয়ে ফিরে আসে।

এদিকে মধুসূদনের দিকে "যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহমনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবী সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন্ দিক থেকে কেমন করে আক্রমণ করবে ভেবে পায় না।" ক্রমে সে বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। ব্যবসায় কাজেও শৈথিল্য ঘটতে লাগল। একদিন সে নিজেই তেলবাতির কুঠুরির ঘরে গিয়ে কুমুদিনীর সঙ্গে সন্ধি করল, কুমুদিনী মধুসূদনের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না, ঘরে এল। সে মনকে বোঝালো এ সেই ঠাকুরেরই আহ্বান। "নিমেষে নিমেষে তার হাতে তাঁর হাত আছে, তার সমস্ত শরীরে তাঁর সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান।" "তিনি রইবেন ছদ্মবেশে।"

এ কি সত্য? এবং এ কি সম্ভব? তবে খুঁটিনাটি নিয়ে বিতর্ক বিবাদ বাধে কেন রোজ? দেহ নিবেদনের পর কেন এই অশুচিতার

সংশয় জাগে? "যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি ওই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে?…যে-শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য?"

ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস গেল নড়ে, আর তো ভক্তি অচঞ্চল রইল না। তার কল্পনার সঙ্গে যে কোথাও মিল নেই।

এ কি ডিস-ইলিউসান? মোহমুক্তি?

"একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করছে রাহুর মতো।…যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা।"

আর "মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।" এ স্বভাবকে বদলাবার চেষ্টায় তার ছোটভাই যে ফন্দী এঁটেছিল তার ফলও স্থায়ী হয় নি।

কুমুদিনী যখন কিছুতেই মন দিয়ে মধুসূদনকে গ্রহণ করতে পারল না, মধুসূদনও কুমুদিনীকে সর্বতোভাবে পেল না কিন্তু তার মধ্যে ক্ষুধিত বাঘ সারাক্ষণ তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় সামলাবার জন্য সেদিকে মনোযোগ দিতে হ'ল তখন কুমুদিনীর লাঞ্ছনা সুরু হ'ল অন্যভাবে। শ্যামাসুন্দরী হ'ল বাঘের শিকার। এই সংকটের মুখেই কুমুদিনী গেল দাদার কাছে। কথা ক্রমে বিপ্রদাসের কাছে এবং কুমুদিনীর কানেও গেল। বিপ্রদাস আর কুমুদিনীকে লাঞ্ছনার মধ্যে ফিরে যেতে বলতে রাজী নয়। বিপ্রদাস কুমুদিনীকে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, যে কোন একজন মেয়ের নয়।…কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবী করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।" বিপ্রদাস লড়াইয়ের সঙ্কল্প জানাল। "যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।"

মোতির মা যখন কুমুদিনীকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার কথায় বলল, "পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে ; মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।" বিপ্রদাস বলল, স্থিতি কোথায় ? অসম্মানের মধ্যে ? মোতির মা বলেছিল "একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।" বিপ্রদাস বলেছিল, "যেতেই হবে এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।"

মোতির মার সঙ্গে আলাপ করে "বিপ্রদাস বুঝতে পারলে মেয়েদের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম।" কুমুদিনীকে সে যখন বোঝাতে চেষ্টা করেছে কুমুদিনীও জানতে চেয়েছে ঃ "দাদা তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে ?" বিপ্রদাস জবাব দিয়েছিল, "অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না—এই আমার মত।"

মোতির মাব দৃষ্টিতে এসব বাড়াবাড়ি। সে বিরক্ত হ'ল।

মধুসূদন যখন নিজে এসে কুমুদিনীকে ঘরে ফিরতে বলল, কুমুদিনী বলল, না। মধুসূদনেব তখন অর্থেব জবরদস্তিটাই একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে মনে পড়ল। পুলিশের ভয় দেখাল। বিপ্রদাসকেও বলে গেল "তোমার ভুবনগবেব ক্ষুর মুড়িয়ে দেব তবে আমায় নাম মধুসূদন।

বরাবর এই-ই মধুসূদন ; গ্রাম্য, ইতর, দাম্ভিক, সংস্কৃতি-সৌজন্যের চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু একান্ত স্বাভাবিক। কালুদা শুনে বলল, সর্বনাশ। বিপ্রদাস বলল, সর্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।"

কিন্তু ইতিমধ্যে যে চরম সর্বনাশের সংবাদ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তা তো ওরা ভাবতে পারে নি। ক্ষেমা পিসির সঙ্গে মোতির মা লক্ষণ মিলিয়ে সন্দেহ করছে—"কুমু গর্ভিণী। মোতির মা খুশি হয়ে উঠল।...এযে নাড়িতে গ্রন্থি লাগল, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন করে!"

শুনে কুমুর মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। 'স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের

পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয় তার উপাদানগুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায় ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইশারায়, যখন কিছুই করছে না, তখনকার অনতিব্যক্ত ইঙ্গিতে গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেই জন্যে পয়সার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্রের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা পূজার কথা মধুসূদন বার বার তুলত কুমুর পিতৃকূলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষায়, কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহ মনের। ওর সংস্কারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীর মনকে সংকুচিত করে তুলেছে। ···(সেই) মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে।"

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেল। মধুসূদনের তরফ থেকে ভয়-দেখানো চিঠি আসতেও লাগল। কিন্তু বিপ্রদাসের আর সংগ্রামের সংকল্প নেই। শেষ পর্যন্ত কুমুদিনীকে সে এই বলে সান্ত্বনা দিল, "তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন ভরে উঠবে।"

সেই অসম্মানের সেই লাঞ্ছনার সেই দাসত্বের এবং সেই মধুসূদনের অশ্রদ্ধেয় স্থূল legalised prostitution এর ঘরে ফিরে যেতে হবে —"তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘর ছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায় ?"

এ নিতান্তই ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ, অন্যায় জেনেও অন্যায়ের কাছে আত্মবলিদান, মধুসূদনের কুরুচির কাছে নতিস্বীকার—একটি মাত্র

যুক্তিতে, কুমুদিনী গর্ভিণী। ঘোষাল-চাটুয্যের দ্বন্দ্ব-সমাস এইখানে এসে মিলল এবং এই কি যোগাযোগ ?

তবু কুমু জেদ ক'রে বলছে, "চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়ো বউ তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই ?"

কিন্তু এই পরিণত বয়সের, ১৯-২০ বছরে পরিণত স্বাতন্ত্র্যবোধ, এই তো ছোট ছোট পবিবারে সঙ্কট সৃষ্টি করছে। এ টানছে এদিকে, ও টানছে ওদিকে, বন্ধন শুধু অবাঞ্ছিত বালগোপালগোষ্ঠী। এ যে আরও অস্বস্তির কারন। সব যুক্তির পরও তাই কেমন একটা বিষণ্ণতার নিস্তব্ধ সুর যোগাযোগের উপসংহারে। বিপ্রদাসের নির্ভাবনার আশ্বাস অন্তহীন ভাবনারই নামান্তর। কিছুরই যেন প্রয়োজন নেই। একটা পরম ঔদাসীন্য। রোদ আসছে আসুক। বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল।

এ কি নিদারুণ অবসন্ন বিষণ্ণ সমাপ্তি !